KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : 28 চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৬
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৩০/- ৩০/- ৩১/- ৩২/-	Year of Publication : বৈশাখ ১৩৮৯ ॥ May 1982 কার্তিক ১৩৮৯ ॥ Nov 1982 বৈশাখ ১৩৯০ ॥ May 1983 কার্তিক ১৩৯০ ॥ Nov 1983
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

সমকালীন : প্রবন্ধের পত্রিকা — সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

ত্রিংশ বর্ষ ॥ বৈশাখ ১৩৮৯

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০

।। কলকাতা আজ ও কাল ।।

গার্ডেনরীচ জল প্রকল্প

কলকাতায় পানীয় জলের কথা বলতে গেলে অধিকাংশ লোকই জানেন যে জলটা আসছে পলতা থেকে টালায় এবং টালা থেকে যাচ্ছে সর্বত্র।

এক পলতা-টালার ওপর নির্ভর করে এতদিন যদিও বা চলছিল, কিন্তু বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা আর মিটছিল না। যদিও সি, এম, ডি, এ ইতিমধ্যে পলতার ক্ষমতা ৮ কোটি গ্যালন থেকে বাড়িয়ে ১৪ কোটি গ্যালন করেছে।

তাই নতুন জল প্রকল্প হিসাবে দুটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে—একটি গার্ডেনরীচ আর একটি হাওড়ায়। দুটির শেষ হবার মুখে। আজকে গার্ডেনরীচ প্রকল্পের কথা বলছি। কারণ আগামী ১৫ই মে এটি অনুষ্ঠানিকভাবে চালু হবে।

মিউনিসিপ্যালিটির এক প্রান্ত প্রায় বজবজ রোডের কাছে যে জল প্রকল্পটি আগামী ২-৩ মাসের মধ্যেই শেষ হতে চলেছে তার ক্ষমতা হল দিনে ৬ কোটি গ্যালন। এই থেকে দক্ষিণ কলকাতা, যাদবপুর, টালিগঞ্জ ইত্যাদি এলাকায় দেওয়া হবে প্রায় সাড়ে তিন কোটি গ্যালন আর বাকিটা যাবে গার্ডেনরীচ, সাউথ সুবার্বন এবং বজবজ মিউনিসিপ্যালিটির জনগণের চাহিদা মেটাতে। (ভবিষ্যতে রাজপুর এবং বারুইপুরেও যাবে)

হুগলী নদী থেকে জল তুলে সেটাকে পরিস্রুত করে ক্লোরিন মিশিয়ে এই বিস্তীর্ণ এলাকায় পাঠাতে হলে বিরাট পাইপ লাইন বসাতে হয়, তার কাজও সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে এসেছে। **কাজেই শুধু আশা নয়, নিশ্চিতই বলা যায় যে এই নতুন প্রকল্পটি কয়েক লক্ষ মানুষের জলের প্রয়োজন মেটাবে,** আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই।

এত বড় একটি প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার থেকে আরম্ভ করে সাধারণ কর্মীদের অক্লান্ত চেষ্টার ফল। আমরা জানি যে এই পাইপ লাইন বসাতে গিয়ে আমরা বহু লোকের অসুবিধা সৃষ্টি করেছি। আমরা এও জানি যে জনগণ সে অসুবিধা সহ্য করেছেন কারণ তাঁরা জানেন যে একটা ভাল কাজের জন্য এই খোঁড়াখুঁড়ি করতে হয়েছে।

পানীয় জল মানুষের প্রথম প্রয়োজন। এতদিন পর্যন্ত এই প্রয়োজন পুরোপুরি মেটানো সম্ভব ছিল না বলেই গভীর নলকূপ খুঁড়ে ব্যবস্থা করতে হয়েছে। কিন্তু আর দেরি নেই। শিগ্‌গিরি মাটি হতে জল তোলার প্রয়োজনীয়তা এই সব অঞ্চলে কমে আসবে। জনসাধারণ পরিস্রুত জল পাবেন গার্ডেনরীচ প্রকল্পটি থেকে। (ইতিমধ্যে অকল্যাণ্ড স্কোয়ারে ভূগর্ভ জলাধারের কাজ শেষ হয়ে গেছে)।

আপনারা জানেন কি না জানি না কলকাতার মানুষ ভারতবর্ষের অন্যান্য শহরের তুলনায় অনেক বেশি জল পাবেন। সরকার ও সি, এম, ডি, এ-এর চেষ্টায় এবং জনসাধারণের সহযোগিতায় কলকাতা উন্নয়নের দিকে আর একটি বড় পদক্ষেপ হল এই গার্ডেনরীচ জল প্রকল্প।

নিবেদন : আমরা যখন ট্যাপ খুললেই জল পাই আমরা তখন মনে রাখি না যে এর পেছনে কত পরিশ্রম, কত উদ্যম এবং কত বাধা ও অসুবিধা। **পানীয় জলের সুব্যবস্থা হচ্ছে। আশা করি জলের অপচয় হবে না। সেটা দেখা সকলেরই কর্তব্য।**

(জনসংযোগ বিভাগ, সি, এম, ডি, এ, কলিকাতা—১৭)

ত্রিংশ বর্ষ ১ম সংখ্যা

স

বৈশাখ তেরশ উননব্বই

সমকালীন ।। প্রবন্ধের পত্রিকা

সূচীপত্র

১৯৯ সন : অজিত দত্ত ৯

পঞ্চদশ ষোড়শ শতকের বাংলার আহার্য ও নৈবেদ্য : শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর ১৩

চর্যাগানে শ্রমিকসমাজ : রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী ১৮

দেবী অন্নদা : আর্যব্রাহ্মণ্যধর্ম বনাম প্রাগার্য কৌমধর্মের প্রভাব : অর্চনা মল্লিক ২৩

মহাকবি পাণিনি : কালীজীবন চক্রবর্তী ৩১

সমালোচনা : পুঁথিপত্রের আঙিনায় সমাজের আলপনা : নরেশচন্দ্র জানা ৩৭
পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (জীবনালেখ্য) : নন্দন মজুমদার ৩৮
সিন্ধু সভ্যতার স্বরূপ ও অবদান : সরিৎশেখর মজুমদার ৪০

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক সুশীল প্রিন্টার্স ২, ঈশ্বর মিল বাই লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-৮৭ হইতে প্রকাশিত।

Hindustan Motors Limited

Manufacturers of Hindustan Ambassador Car,
Hindustan Truck, Hindustan Trekker and
Heavy Earthmoving Equipment

Registered Office : 9/1, R. N. Mukherjee Road,
Calcutta—700001.

Factories at : Hindmotor (West Bengal) &
Trivellore (Tamil Nadu)

সমকালীন

বর্ষ ৩০ বৈশাখ ১৩৮৯

১৯৯৯ সাল !

অজিত দত্ত

লিখতে বসেছি ১৯৯৯ সালের কথা, কিন্তু আর আঠারো বছর আগের এই আজকের ছুনিয়ার চেহারা দেখেই যে আমাদের চক্ষু স্থির, সেদিনকার কথা ভাববো কেমন করে? সেদিনকার কথা ভাবতে গেলেই তো পেটের ভেতর হাত-পা সেঁধিয়ে যাচ্ছে।

আজকের ছুনিয়া গুণ্ডামি-ভণ্ডামি-ডাকাতি-কালোবাজারির ছুনিয়া; আর তারও বাড়া, রাজনীতির ছুনিয়া। এ-ছুনিয়ার আসল মালিক তো সেই সব কাজের কাজীরাই। ঝঞ্ঝাট যত সাধারণ মানুষের। তার পেটে ভাতও জোটে না, পরনের বস্তোরখানাও তালি-তাপ্পি মারা, তারও ওপর আছে, মুখ বুজে খেটে যাও, দাঁড়ালেই লাথি-ঝেঁটা।

এ যেন সেই, শুকনো কালির বোতলটা, কালিটা গেছে ফুরিয়ে, পড়ে আছে শুধু শুকনো তলানিটুকু। সেই বোতলে জল ঢেলে দেখুন, তার শুকনো নোংরাটুকু গুলে গিয়ে ভরিয়ে দেবে গোটা বোতলটাকে।

আমাদের পৃথিবীর অবস্থাও আজ ওই কালির বোতলটারই মতন। গুণ্ডামি-ভণ্ডামি-ডাকাতি-খুনখারাপি সবই ছিল, তবে তার ঠাঁই ছিল সমাজের একেবারে নিচুস্তরের গলি খুঁজিতে। কিন্তু সমাজের সেই তলানিটুকুই আজ ভেসে উঠে গোটা গ্রহ গুলজার, ফলে সাতে নেই, পাঁচে নেই, সাধারণ মানুষগুলোর উঠছে নাভি-শ্বাস।

পান্দোরাকে মনে আছে? রূপে তিলোত্তমা, পৃথিবীর সেই প্রথমা রমণী? উপমান-উপমেয় হিসেবে তিলোত্তমা-পান্দোরার নাম উচ্চারণ করেই মনে পড়লো, ছুজনেই সৃষ্ট তো প্রায় একই উদ্দেশ্যে। পান্দোরা সৃষ্ট হয়েছিল পৃথিবীর মানুষকে 'জ্বালাতে' আর তিলোত্তমাকে গড়া হয়েছিল সুন্দ-উপসুন্দকে

খতম করতে। তফাত শুধু একটা জায়গায়, তিলোত্তমার তিলার্ধও আজ কোথাও অবশিষ্ট নেই, কিন্তু পান্দোরা ? সে নেই বটে, কিন্তু তার 'দান' দিন-দিন উপচে পড়ছে।

যাইহোক, হিফেস্টাসের দেওয়া বাকসোটা পান্দোরা খুলে ফেলেছিল তার স্বাভাবিক-মেয়েলি -কৌতূহল-বশে তারই ভেতরকার সমস্ত আপদ আজ বহুগুণ বর্ধিত হয়ে ভন-ভন করছে আমাদের চারধারে, ফলে সাধারণ মানুষের প্রাণটুকু আজ ওষ্ঠাগত। তবু বলবো, বরাতটা আমাদের খুব একটা ফাটা নয়।—বাকসোর ডালাটা পান্দোরা শেষ পর্যন্ত বন্ধ করতে পেরেছিল। শুধু সেই জন্যেই আমরা, এই সাধারণ মানুষেরা এত মারি নিয়ে বাস করেও মরিনি।—পান্দোরা সব আপদই বের করে ফেলেছিল, শুধু ধরে রাখতে পেরেছিল কুহকিনী আশাকে। তাই বোধহয় এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত ঝড়, এত ঝাপটা সয়েও আমরা বেঁচে আছি। আর, বেঁচে আছি বলেই বিশ্বাস করি, ওই যে বোতলটার কথা বলেছিলুম, সেটা একদিন পরিষ্কার হয়ে যাবে, ঝকঝকে হয়ে উঠবে ধুয়ে, পুঁছে। তারপর ? তারপরেই হয়তো আবার নেবে আসবেন আকাশের সেই 'দেবতারা' আমাদের এ-পৃথিবীর মাটিতে।—এ সবই অবশ্য সেই আশার আশ্বাস !

ভবিষ্যবাণী এক অদ্ভুত বস্তু। মিশেল্ দ'নস্ত্রাদামকে চেনেন তো! সেই যে, রাণী কাথরীন দ'মেদিচির বন্ধু ছিলেন! তাঁর উপদেষ্টাও ছিলেন নস্ত্রাদাম। তাঁরই লেখা কবিতার বই আছে একখানা, নাম তার 'শতাব্দীনিচয়' (Centuries)। বইখানা কবিতায় লেখা হলেও আসলে সেটা ভবিষ্যবাণীর বই। ন'শোটি চতুষ্পদী কবিতার ভরা সেই ভবিষ্যবাণী-গ্রন্থ। ওই গ্রন্থেই ছিল হিটলারের কথা, তার পতনের কথা, এমন কি পারমাণবিক বোমায় যুদ্ধের অবসানের কথাও তাতে ছিল। কিন্তু এই শতাব্দীর তাঁর শেষ বাণীটি সত্যিই 'দিল্‌চস্প্'। সে-বাণী ১৯৯৯ সাল সম্পর্কে। সেই ভবিষ্যবাণীর কবিতাটি ভয়ে ভয়ে তুলে দিচ্ছি, কেননা ফরাসী চতুষ্পদী আমার হাতে হয়ে গেছে ষট্‌পদী। তা হোক, খেমা-ঘেন্না করে এই ষট্‌পদীই একবার পড়ে দেখুন,—

দু'হাজার সাল মিলিয়ে যাবার বছর-খানেক আগে
জুলাই মাসের এক তারিখের একটি শুভক্ষণে,
স্বর্গ থেকে আসবে নেবে, রাজার রাজা সে যে,
তুলতে টেনে সবহারাদের নতুন মহিমাতে।—
নির্দেশে তাঁর চলবে সবে বিপুল গরিমায়
সবার ভালো ঘটবে সেদিন আগের নমুনায়॥

'সবহারা' কথাটা আমি ব্যবহার করেছি নস্ত্রাদামের 'চাষা-ভুষো' তথা সাধারণ মানুষ (Jacquerie) কথাটার পরিবর্তে। কোন 'মানুষ' যে এখানে সেদিন রাজা হয়ে বসবে, এমন কথা নস্ত্রাদাম্ বলেননি, বরং পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, শক্তিমান এক রাজা নেবে আসবেন আকাশ থেকে, নিরেনব্বই সালের কোন এক তারিখে এবং তিনিই কাজ চালাবার ভার দেবেন, সাধারণ মানুষেরই এক প্রতিভূর হাতে।

এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে, আবারও ঘটবে! পৃথিবীতে বসবাসকারী বহির্জাগতিক-রাজারা

এককালে নজর রেখেছেন এ-গ্রহের সর্ব ব্যাপারে, আর তাঁদেরই প্রতিনিধি, মানুষ-রাজারা পালন করেছেন প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব, নজরে রেখেছেন এ-পৃথিবীর দৈনন্দিন কাজে-কর্মে।

কাস্কারা• এবং সপ্ত পৃথিবী কবে তলিয়ে গেছে মহাসাগরের অতল তলে, তার হদিস আজ হারিয়ে গেছে আমাদের মন থেকে, মনে আছে শুধু তাঁদের শেষ রাজা অতলান্তিসের কথা। সে-সোনার দেশও যখন তলিয়ে গেল আটলান্টিকের গভীরে, বহির্জাগতিক-মহামানবেরা তখন বিদেয় নিলেন এ-গ্রহের বাস তুলে। তখনো সে-দ্বৈতশাসনের প্রতীক বহন করেছেন রাজা মীনিস্, নীল-নদের কূলে মিসরে।

নস্ত্রাদামের ভবিষ্যবাণী, প্রবল প্রতাপ এক রাজা আবার নেবে আসবেন আকাশ থেকে, আবার গড়ে তুলবেন জনগণের রাজত্ব নতুন করে। দেব-মানবের দ্বৈতশাসন আবার প্রতিষ্ঠিত হবে অনতিদূর ভবিষ্যতে,—আমাদেরই এই পৃথিবীতে।

এ কথা কিন্তু একা নস্ত্রাদামই বলেননি। এ-ভবিষ্যবাণী আরো অনেকের। কাউন্ট্ লুই দ'হামন্‌কে চেনেন তো, সেই যে যাঁকে 'চেরো' বলে ডাকা হয় ? ওই একই সময়ের কথায় তিনি বলেছেন, গিজার বড় পিরামিডের তলায় আবিষ্কৃত হবে এক মন্দির, আর তার গর্ভগৃহ থেকে যে-বিপুল পরিমাণ ধনরত্ন বের হবে, পৃথিবীর মানুষ তার কল্পনাও কোনদিন করতে পারেনি। সেখানেই পাওয়া যাবে পিরামিড গড়ার কলা-কৌশলের বিচিত্র কায়দা-কানুনের ছক। সে সব পদ্ধতি আজো আমাদের জ্ঞানের অগোচর। আর যে-প্রকাণ্ড জ্ঞান-বিজ্ঞানের হদিস বের হবে সেখান থেকে, আমাদের বিংশশতাব্দীর প্রোন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান তার কাছে প্রায় ছেলেখেলারই নামান্তর।

এডগার্ কেস্‌ও বলেছিলেন সেই কথা। তাঁকে নিশ্চয় মনে আছে আপনাদের ? কেস্‌কে 'দেখেছেন' দানিকেনের 'দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ ?' গ্রন্থে—তাঁর সম্পর্কে কিছু বই-পত্তরও আছে অবশ্য—। কেস্ বলেছিলেন, ১৯৫৮ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত কালের মাঝে মেরু-সঞ্চালনের ফলে ঘটবে এক ভীষণ জল-প্লাবন, সেই সঙ্গে শুরু হবে আগ্নেয়গিরির প্রবল অগ্ন্যুদ্গার আর আটলান্টিক আর প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে জেগে উঠবে নব নব ভূখণ্ড, ভেসে উঠবে ডুবে-যাওয়া অতলান্তিস। প্রত্নবিৎ সেখানে খুঁজে পাবেন প্রকাণ্ড একটি মন্দির, যার গর্ভগৃহ থেকে পাওয়া যাবে কত শত নথি, কত কত প্রাচীন পুঁথি—নানা দুর্বিপাকের পর আবার জাগবে মানুষের শুভ-বুদ্ধি, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের মহাবন্ধনে বাঁধা পড়বে দুনিয়ার প্রতিটি মানুষ।

এ সব কথা যাঁরা বলেছিলেন, আজ তাঁরা সকলেই ভিন্ন-লোকের বাসিন্দা। একজন কিন্তু আজো আছেন আমাদেরই মাঝখানে। তিনি শ্রীমতী জীন্ ডিক্সন্। তাঁর সঙ্গেও আপনাদের পরিচয় ঘটেছে, দানিকেনের 'আবির্ভাব' গ্রন্থের পাতায়। তিনি বলেছেন, আশির দশকের মাঝ বরাবর পৃথিবীর সাগরে আছড়ে পড়বে বিশাল এক ধূমকেতু। ফলে, ডেকে যাবে বিপর্যয়ের বান, পৃথিবীর নানা স্থানে। এই আশির দশকেই বাধবে এক মহাযুদ্ধ চীনের সঙ্গে রুশ-মার্কিন মহাজোটের। আর তখনই আবির্ভূত হবেন নতুন এক অবতার এই পৃথিবীর মাটির কোলে। সে অবতার হিন্দু নন, মুসলমান নন, ইহুদি নন, খৃষ্টানও নন। রাণী নেফ্রিতিতি আর ফারো আমেনহোটেপের বংশধর তিনি। এ-বিশ্বে তিনিই স্থাপন করবেন চির-শান্তির সুদৃঢ় ভিত্তি নতুন করে।

এ সবই হয়তো সেই পান্দোরার বাকসোয় ধরে রাখা আশাটুকুরই আশ্বাস। তবু, সেটুকুর ভরসাতেই যে বুক বেঁধে এগিয়ে চলি।

আজকের আকাশ গাঢ় কালো মহামেঘে ছেয়ে গেছে। মহাদুর্যোগের পূর্বাভাষ সে-আকাশের গায়ে, কিন্তু তারই পেছনে যেন শুনতে পাচ্ছি এক নবযুগের পদধ্বনি! সে-শুভদিনের প্রসাদ, জানি আমার বরাতে জুটবে না, কিন্তু যাদের বরাতে জুটবে, তারাও তো আমারই আপনজন, তাই তো আমার মন জুড়ে রয়েছে ঔৎসুক্য,—আর সেই সঙ্গে আনন্দও বটে।

---

*'কাস্থারা ও সপ্ত পৃথিবী'—য়োসেফ এফ. ব্লুমরিশ (Kassuara und die sieben Weltern)।
—বাংলা অনুবাদ

পঞ্চদশ ষোড়শ শতকের বাংলায় আহার্য ও নৈবেদ্য

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর

ভারতীয় সংস্কৃতির বহুমুখিতার মধ্যে এটিও একটি যে, নীরূপ নিরাকার কোন এক অতীন্দ্রিয় সত্বাকে ঈশ্বর ভগবান এবং সর্বপ্রকার সৃজন-শক্তির আধার তিনি এই ভাবে প্রতিভাবনা করার প্রয়াস। এই প্রয়াসটি অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকদের মধ্যে যাঁরা ভক্তিবাদী দার্শনিক তাঁদের মধ্যেই সর্বাধিক।

তাঁরা শ্রুত কাহিনীর নায়ক নায়িকাদের মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তির আবেশ, এবং অবতারবাদ উপস্থাপিত করে কালোচিত বাস্তব পরিবেশের মধ্যেই যে তাঁর বা তাঁদের সামগ্রিক আচার আচরণের সমাবেশ, এই চিন্তনাকেই লীলাবাদ ব'লে ব্যাখ্যা করেন। ভক্তিবাদিদের প্রচারিত এই লীলাবাদের জনক হিসাবেই আমরা মহাকবি বাল্মীকিকে প্রথম পথিকৃৎ বলে মেনে আসছি। কারণ রামচরিত্রের আদি সূত্র তিনি পেয়েছিলেন নারদের কাছে, এবং তা প্রথমে ছিল কোন এক কাহিনীর নায়কের কথা। তার পর বাল্মীকি তাঁর যোগ দৃষ্টিতে অথবা কল্পনার প্রতিভাশক্তিতে তৎ কালোচিত পরিবেশে এক সামন্ত রাজ পরিবারের সুখ দুঃখ সমন্বিত নায়ককে বা রামকে চমৎকার কাহিনী মণ্ডিত করে, যে কাব্য রচনা করেছেন, পরবর্ত্তিকালে, সেই নায়ক নায়িকাই ঈশ্বর ঈশ্বরী হয়েছেন এবং তাঁদের চরিৎ কাহিনীই হয়েছে লীলা কথা।

রামলক্ষ্মণ সীতাভী রাজ্ঞা দশরথেন চ।
সভার্য্যেণ সরাষ্ট্রেণ যৎপ্রাপ্তং তত্র তত্ত্বতঃ॥
হসিতং ভাষিতং চৈব গতি র্যাবৎচ চেষ্টিতম্।
তৎসর্বং ধর্মবীর্যেণ যথাবৎ সংপ্রপশ্যতি।
ততঃ পশ্যতি ধর্মাত্মা তৎ সর্বং যোগমাস্থিতঃ।
পুরা যৎতত্র নিবৃত্তং পাণাবামলকং যথা। (রামায়ণ/আদি/তৃতীয়) অর্থাৎ

নারদের মুখে শোনা কাহিনীটির নায়ক রাম, লক্ষ্মণ, সীতা এবং দশরথ পর্যন্ত, যাবতীয় কথালাপ, সবই অতীতের হলেও বাল্মীকি তাঁর যোগশক্তিতে সবই দেখতে পেলেন, এমনকি তাঁরা যেমন করে হাসতেন, কথা বলতেন, চলা ফেরা করতেন সবই দেখতেও শুনতেও পেলেন।

মহাকবির এই রচনার পর থেকে, ভারতে যতগুলি মহাকাব্য রচিত হয়েছে, কোনটির নায়ক নায়িকা ঈশ্বর ঈশ্বরীর আখ্যা পেয়েছেন কোনটির বা মহাপুরুষ দেবতা, লোকদেবতা প্রভৃতিও হয়েছেন। তাঁরা কি খেতেন, কি উপদেশ দিতেন, তাঁদের জীবন কি ভাবে গঠিত হয়েছিল, কি কি অলৌকিক কাজ করেছিলেন সবই গ্রন্থকাররা নিজেদের মনের পরিবেশগত উপদান দিয়ে সাজিয়ে দেন। খৃষ্টীয় ৪র্থ থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষায় রচিত এমনি গ্রন্থাবলীর নাম পুরাণ। আর তাদিকে অনুসরণ করে দেশীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থমালা, পাঁচালি, মঙ্গল কাব্য এবং পদাবলী সাহিত্য। সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত রচিত দেশীয় ভাষার গ্রন্থগুলির মধ্যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞান দাস, জগদানন্দ প্রভৃতির পদাবলী সাহিত্যের মাধ্যমে বঙ্গবাসী আমাদের সামাজিক মন খুবই

প্রভাবান্বিত। ঈশ্বর ঈশ্বরীর সুখ দুঃখ বিরহ উচ্ছ্বাস অনুরাগ সবই আমাদের সামাজিক মন ও ব্যক্তিমনের ঐকান্তিক।

এই সব সাহিত্যের ভাব ভাষায় ও নায়ক নায়িকার চরিত্রে প্রতিটি প্রদেশের লোকাচার খুবই পরিস্ফুট। রমণী দেবীরা বাংলায় সিন্দুর পরেছেন, নাকে নাকছাবি, কানে দুল, মাথায় খোঁপা, আঁচল, পাড়ের বাহার, বিছানার পরিপাটি যেমন প্রদেশ গত বৈশিষ্টের ছাপ রেখেছেন, তেমনি খাদ্য পানীয়েও প্রাদেশিকতার ছাপ রেখেছেন।

পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর রচিত এমনি একটি গ্রন্থের কিছু অংশ থেকে দেখতে পাই, তৎকালের বাংলায় বিশিষ্ট পরিবারে মধ্যাহ্নের আহারের সময় কি কি ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা হতো। গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদী" আর গ্রন্থকারের নাম কবি কর্ণপুর। এর পরিচয় সমকালীন পত্রিকার ১৩৮১ সালের আশ্বিন মাসের (২২ বর্ষ ৬ম সংখ্যা) প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রন্থটিতে বক্তব্য রেখেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার দৈনন্দিন আচরণ বা লীলা। নন্দগৃহিণী যশোদার অনুরোধে শ্রীরাধা প্রত্যহই আসতেন নন্দালয়ে প্রভাতের কিছু পরে এবং দুপুরের খাবার শ্রীরাধাই প্রস্তুত করতেন। এতে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর বাড়ির পরিজন যেমন সুখী হতেন, তেমনি শ্রীরাধারও অনেক সাধ পূর্ণ হতো। শ্রীরাধার বাপের বাড়ির লোকজনের আপত্তি ছিলনা, বরং মাননীয় নন্দঘোষের পরিবারের সঙ্গে এই প্রীতির সম্বন্ধটিকে তাঁরা খুব শ্রদ্ধা প্রীতির চোখেই দেখতেন।

শ্রীরাধা রন্ধন শালায় প্রবেশ করে দেখলেন রান্নার আয়োজন করাই আছে—

"কুষ্মাণ্ডকা-লু কচু মানক কন্দতুম্বী
বার্ত্তাকু মূলক পটোল ফলানি শিম্বী।
ভিণ্ডীশ বারন বুষামকলান্য নীচা
রম্ভা বিশেষ-নবগর্ভ নবীন মোচাঃ।
বাস্তুক-মারিষ পটোল শিখাঃ কলায়
বল্লীশিখা শনচাগ্রিশিখাঃ প্রধায়।
তুম্বী শিখাশ্চ মৃদুলাঃ সহপোদিকা-গ্র্যা
ন্যালোক্য সৈকত সখীঃ সরসাঃ সমগ্রাঃ"

—কুমড়ো, আলু, মান, ওল, লাউ, কচু, বেগুন, মূলা, পটোল, শিম, ঢ্যাঁড়স, কাঁচ কলা, মোচা, টাটকা থোড়, তাছাড়া বেতো শাক, নটে শাক, পলতা, কলায় শাক, মটর শাক, ছোলা শাক, কচি লাউশাক, পুদিনাপাতা প্রভৃতি। এসব উপাদান দেখে শ্রীরাধা তাঁর সখীদের বল্লেন তোমরা তাহলে এবার মসলা গুলি বেটে ফেল। দেখি কি কি মসলা আছে এঘরে, হ্যাঁ, ইত্যবসরে ঐ তরকারি গুলি কুটে ফেল। শ্রীরাধা দেখলেন

এলা লবঙ্গ মারিচার্দ্রক জাত্যজাজী
জাতী-ফলত্যচ হুলাঙ্গলি সজ্জরাজীঃ।
সিদ্ধার্থ-তণ্ডুল নিশা দলিতাংশ্চ মাসান্
কাশ্চিৎ তদা পিপিষু রজদৃশায় শেষান্।

দেখছি এলাচ, লবঙ্গ, মরিচ, আদা, জায়ফল, জৈত্রী, রাই সরষে, হলুদ, নারকেল, জীরে, কাল জীরে, মাষকড়াই প্রভৃতি রয়েছে। এগুলি পৃথক পৃথক করে বাটায় মন দাও কোন কোন সখী। তারপর ওদিকে একটু এগিয়ে গিয়ে সখীদের বল্লেন এবার উনুনটাও ধরিয়ে ফেল। আর একটু এগিয়ে এসে দেখলেন তামার বাসন, পিতলের বাসন এবং রূপার থালা বাটিও ধোয়া পোছা করা রয়েছে।

শ্রীমতী রাঁধতে বসলেন, আর যে তরকারির জন্য যে মশলা লাগবে সবই হাতের কাছে আনিয়ে প্রথমে

শাক ভাজা

শাকাঃ সুপাক ভিদয়া সরসা রসাক্তে
সংমূর্চ্ছিতাঃ কটু তৈল প্রশস্তে।

ভাল সরষের তেলে চমৎকার আঁচে ধীরে ধীরে শাক গুলি পৃথক পৃথক ভেজে রাখলেন। তার পর ২ রকমে কাঁঠাল বীচীর তরকারি করলেন। কাঁঠাল বীচি সিদ্ধ করে, তাতে আদা বাটা ও কাসুন্দী বাটার একটি, আর নারকেল বাটা মিশিয়ে আর একটি—

সংকাস মর্দ দলিতার্দ্রক নারিকেল।
দ্বৈবিধ্যতস্ত সরসা পনসাষ্ঠি খেলাঃ॥

তেতো পাতা সহ সুক্তো—

'যস্মিন্ প্রতস্ত-কটু তৈলগ তিক্ত পত্রীঃ
সং-কাস মর্দ-দলিতার্দ্রক সাধু মৈত্রীঃ।

একটি পাঁচ মিশালী চচ্চড়ী—

কুষ্মাণ্ড কালু কচু মূলক মানকাদি।
তর্কারিকং সুখমুত্তম মভ্য পাদি।

অর্থাৎ কুমড়া আলু কচু মূলা মানের টুক্‌রো গুলি সরষের তেলে ভেজে, তাতেও বাটা মশলা মিশিয়ে চচ্চড়ি করলেন।

মুগডাল বেটে মিশিয়ে বেগুনি ও মুগের বড়া

বার্ত্তাকুভিল'বলবং শকলী কৃতাভিঃ
সংক্ষুদ্র মুদগ বটকা ঘটয়া চিতাভিঃ।

আর এক রকমের বেগুন ভাজা—

ক্ষুন্নার্দ্রকোদ্দলিত লাঙ্গুলি সস্ত পূর্ণং
যত্নে পরং চ সুখদং কটু তৈল শীর্ণম॥

প্রথমে টুকরো বেগুন গুলিকে সরষের তেলে নরম করে ভেজে নামাবার মুখে একটু আদা বাটা এবং তাতে নারকেল বাটা মিশিয়ে দেওয়া হলো।

কয়েক প্রকার ভাজা

বার্ত্তাকু সূরণক মানক কর্করোলৈ

রম্ভা মুখোখ কনিশৈঃ কচুভিঃ পটেলৈঃ।
কুস্মাণ্ডকৈলবলবৈঃ শিত সুচি রাজী
বেধেন নীরস তস্মৈ বিবিধাং ভাজী ॥

—বেগুন, ওল মান কাঁকরোল গর্ভমোচার কচিকলা, কচু, পটল এবং কুমড়ো গুলি অল্প সিদ্ধ করে নামিয়ে শুচ্ দিয়ে বিধে বিধে, তাদের রস গেলে নিয়ে আবার সরষের তেলে চমৎকার করে ভাজা করলেন।

কয়েক রকম বড়া (নোনতা ও মিষ্টি)

বেগুন, কাঁচাকলা, সিদ্ধ করে গোল মরিচ ও কড়াই ডাল বাটা এবং ছানা এবং নারকেল বাটা চিনি মিশিয়ে, কিছু নোন্‌তা বড়া, কিছু মিষ্টি বড়াও করলেন।

ভণ্ডা কি কাম কদলী ফল নারিকেল
মিক্ষাম্র মাষ বটকৈঃ পটুভিঃ সুমেলা।
আসি ক্ষকাথ্য বটিকা মরিচৈঃ সিডাভিঃ
কামং কটুশ্চ মধুরাচ বভুব তাভির ॥

মূলোর ডাল—

এর উপাদান—খোসা ছাড়ান কড়াই ডাল সিদ্ধ করে, ঘিএ সাতলে একটু ভাজা হিং, আদা বাটা, নুন এবং চাকা চাকা করে কেটে সিদ্ধ করা মুলো গুলি তাতে মিশিয়ে আর একটি ডাল ব্যঞ্জনও করা হলো।

আর এক রকম মুগের সূপ—

আপিষ্ট পীড়িত সুলাঙ্গলি সত্ত দুগ্ধৈঃ
স্বিন্নঃ সিতো পাক রসৈ রপি গব্য দুগ্ধৈঃ।
এলা লবঙ্গ মরিচার্দ্রক হিঙ্গু ভূপঃ
সন্নারিকেল বটকোহ জনি সৌদগ সূপঃ ॥

অর্থাৎ প্রথমে নারকেল শাঁস মিহি করে বেটে, চটকে তাতে চিনি মিশিয়ে মুগডাল বাটার সঙ্গে মিশিয়ে ঘিয়ে ভেজে বড়া করে রাখা হলো, তার পর গাই দুধ জ্বাল দিয়ে ঐ বাটা এবং মুগডাল কিছু মিশিয়ে সেটি নামান হলো, তাতে দুধের বড়াগুলি ফেলে এলাচ লবঙ্গ মরিচ ভাজা মাপ হিং একটু আদা বাটা মিশিয়ে যেটি তৈরী করলেন, সেটি মুগের সূপ।

আর এক রকম সূপ। এটি বরবটী দিয়ে। মোচার বড়া (মোচার চপ্) ছোলার ডালের বড়া, দুধলাউ চাল কুমড়ার সুক্তা, ছানার বড়া দিয়ে সূপ (ছানার ডালনা) ছোলা বাটা দিয়ে বড়া করে, দই মিশিয়ে দই বড়া, শুকনো আমসী ঘিয়ে ভেজে ভাজা সরষের গুড়ো ও একটু মিষ্টি মিশিয়ে এক রকম চাটনী। আবার তিল বাটা ভেজে আমসীর চাটনী, আমড়ার মিষ্টি অম্বল, চালতার অম্বল।

তারপর সরভাজা, দুধ পুলি, সরদুধকুপী, মুগডালের কচুরী তো হলোই, আরও যে সব মিষ্টি তৈরী হলো সেগুলির অনেক নাম, ও রান্নার পদ্ধতি আজ বাঙ্গালাবাসী ভুলে গিয়েছেন—

জীলাবিকা মঠহরী, পুরু পূপগুজা
নাড়ীচয়া কৃত সরস্বতি কাদি পূজাঃ
খর্চুর দাড়িম শর্কর পাল মুক্তা
লড্ডুৎকরান্ বিদধিরেহথ কলাভিযুক্তাঃ।
যামিক্ষি লড্ডুক মনোহর হংকেলি,
শোভারিকা চ দধি খোল বড়াও কেলি।
সংকার্য বা চটুলিতা সহ দুগ্ধফেনী
গোধূম সূত্র জনিতা ললিতা চ বেণী ॥

অর্থাৎ জিলাপী, মঠহরী, গজা, খাজা, নাড়ী, সরস্বতী খইচুর, মতিচুর, পালমুক্তা, নাড়ু, ছানার রস বড়া, মনোহরা হংসকেলি, খোল বড়া, আত্মকেলি, দুধ কেলী, মনোহরবেনী, চন্দ্রকান্তি সরগুটী, সরভাজা, শিখরিনী, ছানার সরু চাকলি, ছানার গর্ভপুর, এমনি কত নামের খাবার শ্রীরাধা তৈরী করলেন।

কর্ণপুর ছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও প্রখ্যাত চিকিৎসক শিবানন্দের পুত্র। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে ভক্তিবাদের রচিত যে কয়টি গ্রন্থ প্রত্যেকটিতেই "রাগাত্মিকা" ভক্তির ভাবনায় ভগবান হয়েছেন বাঙ্গালীর আহার্য পানীয়ে পরিতুষ্ট।

চর্যাগানে শ্রমিকসমাজ

রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী

চর্যাগান বাংলা ভাষার এক প্রাচীনতম নিদর্শন। গানগুলি একটি প্রাচীন পুঁথি হতে সংগৃহীত। পুথির নাম, 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়'। 'চর্যা' শব্দের অর্থ, আচরণীয় এবং 'অচর্য' অর্থে অনাচরণীয়; অর্থাৎ ধর্মসাধনার ব্যাপারে কোন বিষয়গুলি আচরণীয় এবং কোনগুলি অনাচরণীয় তারই নির্দেশ চর্যা-গীতিকারগণ তাঁদের রচনায় আভাস ইঙ্গিতে প্রদান করেছেন।

চর্যাগান বৌদ্ধসহজিয়া সম্প্রদায়ের বাংলা গান। গানগুলির রচনাকাল দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। তৎকালীন সমাজে এই গানের যথেষ্ট সমাদর ছিল। উৎসব ও পালাপার্বণে চর্যাগানের আসর বসত। গায়কেরা বিভিন্ন রাগ রাগিণী সহযোগে গান পরিবেশন করতেন। গান রচয়িতদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন বাঙালী। বাংলাদেশে অর্থাৎ নিম্নবঙ্গে তাঁদের অনেকের বসবাস ছিল। অনেকের মতে চর্যাগানের পটভূমিকা প্রধানত উত্তর বিহার, কলিঙ্গ, বাংলা ও কামরূপ। তবে গানগুলির উৎস যে প্রাচীন বঙ্গ ও কামরূপ, সে বিষয়ে কারো দ্বিধা নেই।

তৎকালীন বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের মান অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল। গানরচয়িতাগণ সিদ্ধাচার্যরা সমকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্থান পতনের সঙ্গে বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন। একটি বিশেষ ধর্মীয় মতের ধারক ও বাহক রূপে পরিচিত হলেও তাঁরা ছিলেন সমাজেরই মানুষ—জীবনপথের পথিক। ধর্মসাধক হলেও তাঁরা পুরোপুরি সামাজিক জীবন বহন করতেন। সামাজিক রীতিনীতি, আচার-আচরণ, ক্রিয়াকাণ্ড ইত্যাদি মেনে চলার যথেষ্ট প্রবণতা ছিল তাঁদের। সামাজিক বস্তু ও তাদের উৎপাদনগুলিকে কোন সময় অগ্রাহ্য করেননি। অধ্যাত্ম সাধনায় সেগুলিকে তাঁরা প্রতীক ও উপমা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অবশ্য ধর্মীয় চেতনার বশে তাঁরা রচনা করলেও, তাঁদের অনেকেরই কবিত্বশক্তি ছিল অসাধারণ। সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলন ইত্যাদিতে চিহ্নিত প্রাত্যহিক জীবনচিত্র.চর্যার দুরূহ দর্শন ও তত্ত্বের নিষ্প্রাণতাকে স্নিগ্ধ কাব্যরসের স্পর্শে সজীব করে তুলেছে।

চর্যাগানে সিদ্ধাচার্যরা সমকালীন লৌকিক জীবনের যে চিত্রগুলি এঁকেছেন, তা কণোদ্ভাসিত হলেও, জীবনরসিক পাঠক এবং ঐতিহাসিকদের কাছে খুবই মূল্যবান সামগ্রী। পদগুলির মধ্যে সামাজিক রীতিনীতি এবং জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি বিষয় প্রয়োজনানুসারে বিধৃত হয়েছে। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, সিদ্ধাচার্যদের সঙ্গে জনজীবনের সম্পর্কটি ছিল অতি ঘনিষ্ঠ এবং প্রত্যক্ষ। গানগুলির মধ্যে লৌকিক জীবনের এমন স্বচ্ছ-সুন্দর সাবলীল বর্ণনা অন্যত্র দুর্লভ। জীবন-চিত্রগুলির মধ্যে বাঙালী-জনজীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয় যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে।

চর্যাপদে তৎকালীন সমাজজীবনের যে বিশ্বপ্রায় খণ্ড খণ্ড চিত্র গুলি বিধৃত, তার মধ্যে রাজা উজিরের কথা নেই,—আছে অতি অখ্যাত সাধারণ বাঙালীর-জীবন ও জীবিকার সহজ সরল বর্ণনা। চর্যাকারগণ অনেকেই ছিলেন নিম্নকোটির মানুষ। তাই চর্যাগানের একাধিক শ্লোকে

নীচু-স্তরের মানুষের আক্ষেপ-পীড়িত জীবনের বাস্তব করুণ চিত্র সজীব হয়ে উঠেছে। এগুলি যে দারিদ্র্যক্লিষ্ট জনজীবনের বলিষ্ঠ ছবি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সমাজে উচ্চতম সম্মান এবং প্রতিষ্ঠা তারা নিতান্তই জন্মসূত্রে অর্জন করতে পারেনি। সামাজিক ক্ষেত্রে সবার নীচে এবং সবার পিছে তাদের স্থান। সবার উপরে অর্থাৎ সমাজের উচ্চমঞ্চে ছিল ব্রাহ্মণ, মাঝে অগণিত শূদ্র-পর্যায়ের সাধারণ মানুষ এবং নিম্নপর্যায়ের অধম সংকর বা অন্ত্যজ। প্রত্যেকটি বর্ণের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য দুরতিক্রম্য বিভেদ ও বিধি নিষেধের প্রচীর। নিম্ন কোটির মানুষ যারা, তাদের জীবন ছিল নিত্য অভাব, পীড়ন-শোষণে ভারাক্রান্ত এবং হতাশা, বেদনা ও নিঃস্বতায় ভারগ্রস্ত। এই ব্যাপক দারিদ্র্যের ম্লান জীবনচিত্র চর্যাগানে নিভুর্লভাবে পরিবেশিত। অবশ্য কতক চর্যাগানে গৃহস্থ ধনী গৃহের কয়েকটি বাস্তবচিত্র বিধৃত হলেও সেগুলির সংখ্যা নিতান্তই অল্প। নিম্নস্তরের অবহেলিত মানুষের জীবনযাত্রা ও আচার আচরণের সহজ সরল চিত্রগুলিকে মর্মস্পর্শী করে তোলার জন্যই বোধ হয় সিদ্ধাচার্যরা ক্ষেত্র বিশেষে কয়েকটা ঐশ্বর্য বিলাসের চিত্র তুলে ধরেছেন। এই বিশেষ চিত্রগুলির মধ্যে তেমন কোন সাবলীল বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায় না। এগুলি নিতান্তই স্বল্প রেখায় আঁকা এবং অসম্পূর্ণতায় পরিপূর্ণ।

চর্যাগানে আমাদের শ্রেণীগত ও বৃত্তিগত পরিচয় অতি প্রাঞ্জল। এক্ষেত্রে নীচ সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার চিত্রগুলি বড় নিদারুণ। এরা সকলেই অন্ত্যজশ্রেণীর সমাজশ্রমিক। সমস্ত রকম সামাজিক মর্যাদা থেকে এরা বঞ্চিত। এদের মধ্যে ডোম, শবর, পুলিন্দ, চণ্ডাল, রজক, চর্মকার, কাপালিক, খট্টজীবি (পাটনি), ডোলাবাহী, (দুলে), মল্ল ইত্যাদি প্রধান। অন্ত্যজ বা অধম সংকর শ্রেণীভুক্ত সমাজ শ্রমিকেরা সমাজের অতি নীচুতলায় বাস করত। এদের জীবনে ছিল চূড়ান্ত অভাব এবং নিদারুণ দারিদ্র্য। কয়েকটি চর্যাগানে এদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়:

'টালত মোর ঘর নাহি পরবেষী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥

[চর্যা ॥৩৩॥/ঢেণ্টন পাদ]

[টিলায় আমার ঘর, পড়শী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই। নিত্যই ক্ষুধিত।]

'নগর বাহিঁরে ডোম্বী তোমারি কুড়িয়া।
ছই ছোই যাইসে ব্রাহ্ম নাড়িআ॥

[চর্যা ॥১০॥/কাহ্নবাদ]

[নগরের বাইরে ডোমনী তোর ঘর। নেড়া ব্রাহ্মণকে তুই ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাস।]

ডোমনীর কুড়ে ঘরে প্রায় আগুন লাগে। আগুনে সব কিছু পুড়ে ছাড়খাড় হয়ে যায়। চারদিকে খরজ্বলা আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী। জল ছিটিয়ে সেই আগুন নেভাতে হয়:

'ভাহ ডোম্বী ঘরে, লাগেলি আগি।
সসহর লই সিঞ্চহু প্যাণী॥
নউ খর জলো ধূম না দিশই।
মেরু শিখর লই গহন পই সই॥ [চর্যা ॥ ৪৭ ॥ [কুক্কুরীবাদ]

[ডোমনীর ঘরে দাহ, হঠাৎ আগুন লেগেছে। পরিশুদ্ধ মনে জল ছিটিয়ে চল। আগুনের তীব্র জ্বালা এবং ধোঁয়া দুই প্রকট। সেই ধোঁয়া সুমেরু শিখর নিয়ে গগনে প্রবেশ করে।]

সে যুগে নৌকা পারাবারের জন্ম মূল্য দিতে হত, যেমন কুড়ি বুড়ি। কড়ি নেই বললে পারার্থীর নিস্তার ছিল না। তবে সর্বাঙ্গ তল্লাসী করা হত এবং কড়ি পাওয়া গেলে তা ছিনিয়ে নেওয়া হত। [চর্যা ।। ১৪ ।।, ।। ৩৭ ।।]।

তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবরণ চঙ্গতা।
তোহর অন্তরে ছাড়ি নড়এড়া।। [চর্যা ১০ ।।/কাহ্নপাদ]

[ডোমনী, তাঁত বেচা হয়, আর হয় চাঙ্গারি। তোর জন্ম এই নটসজ্জা ছাড়লাম।]

উপরিউক্ত চর্যাগানে সমকালীন অন্ত্যজ সমাজ শ্রমিকের আক্ষেপ পীড়িত আর্তি স্পষ্ট হয়েছে। করুণ চিত্রের নিদর্শন হিসাবে পদটি সার্থক।

অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকদের আবার একটি জীবিকা ছিল, মদ্যবিক্রয়। সে যুগে মদ্যপান দোষের ছিল না। শুঁড়িখানার অবস্থান ছিল গ্রামের একটি নির্দিষ্ট যায়গায়। যেখানে দরজা কিম্বা দেওয়ালের গায়ে অথবা ঘরের চালে একটি সাঙ্কেতিক চিহ্ন আঁকা থাকত। চিহ্নটি আর কিছু নয়, একটা শাদা কলসী অথবা শাদা পতাকা। সেই চিহ্ন লক্ষ্য করে মদ্যপিপাসুরা নির্দিষ্ট স্থানে ভিড় করত। সাধারণ স্ত্রীলোকেরাই (শুণ্ডিনী) মদ্য বিক্রয়ের কাজে নিযুক্ত থাকত। শুঁড়ির ঘরে ছোট ছোট ঘড়া ঘটিতে মদ রাখা থাকত। ঘড়ায় সরু নল দিয়ে মদ ঢালা হত। একরকমগাছের ছাল বা শিকড় গুঁড়ো করে মদ চোলাই হত। এই কাজটিও স্ত্রীলোকেরা করত।

এক সে শুণ্ডিনী দুই ঘরে সান্ধিঅ।
চীঅন বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ।। [চর্যা ।। ৩ ।।/ চর্যাকার : নাম অজ্ঞাত]

[এক যে শুড়ি বউ দুই ঘরে ঢোকে। সে চিকন বাকড় দিয়ে মদ বাঁধে]।

সেযুগে নাচগান বা নাটকাভিনয়ের ওপর যাদের জীবিকা নির্ভর করত, তারা অধিকাংশই ছিল সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ। অস্পৃশ্য জাতিরূপেই তাদের পরিচিতি। কুলমর্যাদাজাত বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ্য সমাজের চোখে তারা অন্ত্যজ বা একটি অতি অবহেলিত ম্লেচ্ছ সম্প্রদায়। তাদের ছায়া স্পর্শ করলে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্রাহ্মণদের কলঙ্ক হত। স্পর্শ বিচারের একটা দুর্লঙ্ঘ্য এবং দুরতিগম্য বাধার প্রাচীরে বিভক্ত হয়ে তারা নিত্য ঘৃণা, অপমান এবং অবহেলার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করত। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছিল ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজের বর্ণবৈষম্যমূলক উদ্ধত বিধিনিষেধ। সেই হেতু এই সমাজ-শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রটি ছিল সীমাবদ্ধ। এই ভাগ্যতাড়িত শ্রমিকের দল নগরের মধ্যে অতি কুণ্ঠিতভাবে জীবন যাপন করত। সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রমে তাদের দিন কাটত। জীবনে দুঃখ দারিদ্র্যের সীমা ছিল না। মাঝে মাঝে দুঃসহ জীবনের বোঝা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠত। তখন নিপীড়িত জীবন দুঃসহ যন্ত্রণায় হাহাকার করে উঠত। কাপালিকের অন্যতম পেশা ছিল নটবৃত্তি। নাটকাভিনয়ও এক ধরণের চর্যা। যোগীর বেশভূষায় কাপালিকের নাটকাভিনয় চর্যাপদের একটি উল্লেখ্য চিত্র। কাপালিক নটবেশে নগরে ঘুরে বেড়ায়। সঙ্গে আছে তার নটপেটিকা। নটপেটিকায় নটের সাজপোষাক ও নানা প্রয়োজনীয় জিনিষ থাকে। কাপালিকের চরণে ঘণ্টানুপুর।

এই বেশেই সে নানাস্থানে নাটক করে বেড়ায়। সেযুগে জনপ্রিয় নাটক ছিল—'বুদ্ধ-নাটক'। পরম কারুণিক গৌতম বুদ্ধের জীবন কথার নাট্যরূপ। নাচগান, বাদ্যগীতি ও নাটকাভিনয়ের খণ্ডকায় চিত্রগুলি চর্যাপদে যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে।

শ্রমজীবীর মধ্যে তন্তুবায়দের জীবনচিত্র বড়ই মর্মস্পর্শী। এদের জীবনও সামাজিক বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ। চূড়ান্ত অভাব, পীড়ন, শোষণ এবং নিগ্রহ এদের জীবনে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। হত-দরিদ্র এই মানুষগুলির চেহারা শবের মত শীর্ণ,—পরনে ছিন্ন বস্ত্র, চোখগুলি উপবাসের তাড়নায় কোটরাগত। সমাজপতির সর্বগ্রাসী পীড়নে তারা হৃতসর্বস্ব। প্রীতি-বর্জিত হয়ে তারা বিভেদ ও বর্জনের যন্ত্রণায় মলিন।

তুলা ধুনি ধুনি আঁসুরে আঁসু।
আসু ধুনি ধুনি নিরবর সেসু।।
তউ সে হেরুঅ ন পাবিঅই।
সান্তি ভণই কিণ স ভাবিঅই।।
[চর্যা ।। ২৬ ।। শান্তি পাদ]

[তুলো ধুনে আঁশ পাওয়া যায়। আঁশকেও ধুনে নিরাবরণ করা হল। তবু সেই রোঁয়া পাওয়া গেল না। শান্তি বলে, যতই ভাবি, ভাবা যায় না।]

আর একটি চর্যাগানে একজন তাঁতি বলছে—'আমি সেই তন্তুবায়। সুতো আমার নিজের, অথচ সুতোর লক্ষণ, কি, আমি তা নিজেই জানি না। তাঁতে মাদুর বোনা হয়েছে,—দুই জায়গায় ভাঙ্গা জোড়া দেওয়া হয়েছে। তার ওপর আমি বসেছি। তাঁতির ব্যবসা ছেড়ে আমি এখন বজ্রধর হয়েছি।

উপরিউক্ত দুটি চর্যাগানে সমকালীন তন্তুবায় জীবনের আক্ষেপ-পীড়িত হাহাকার ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে।

চর্যাগানে তাঁতি, ধনুরীর জীবনচিত্রগুলি মোটামুটিভাবে বাংলদেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত। দরিদ্র তাঁতি, ধুনুরী, শবর, রজক, নট-নটীর গার্হস্থ্য-চিত্রগুলি নিঃসন্দেহে বাঙালীর জীবনচিত্র। তবে এগুলি অধিকাংশই নিম্নকোটি বাঙালী সমাজের। বাঙালীর বেদনাপূর্ণ চিত্রকলা, নীচ, অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের দুঃখমলিন জীবনযাত্রা চর্যাপদের অন্যতম সম্পদ। চর্যাকারদের রচনায় ব্যবহৃত প্রতীক ও কারণগুলি প্রধানত নীচ সমাজ হতে গৃহীত এবং তাদেরই প্রতি উদ্দিষ্ট। তাঁতি, ধুনুরী, কৃষাণ, কৈবর্ত, ডোম, শবর সকলেই দারিদ্র্যক্লিষ্ট নিম্নস্তরের মানুষ। দারিদ্র্য তাদের নিত্যসঙ্গী। সেই সমাজের এক দরিদ্র গর্ভিণী নিত্যজীবন যন্ত্রণায় আশাহত। করুণ কণ্ঠে ক্রন্দন করে সে বলছে :

হাঁউ নিরাসী খমন সাঈ।
মোহোর বিগোআ কহন ন জাই।।
ফিটলেসু গো মাত্র অন্তউড়ি চাহি।
না এথু চাহমি সো এথু নাহি।।
পহিল বিআন মোর বাসনপুড়া।

নাড়ি বি আরম্ভে সেব বায়ূড়া ॥
জাণ জোবন মোর ভইলোম।
মূল নখনি বাগ সংঘারা।

[চর্যা । ২০ ॥/চর্যাকার কুক্কুরীপাদ]

[আমি আশাহত। স্বামী ক্ষপনক। আমার পতিসঙ্গ বর্ণনা করা যায় না। আমি প্রসব করলাম গো মা, আতুর ঘরের দিকে আমার দৃষ্টি। এখানে যা জিনিষ চাই, তা নেই। আমার এই প্রথম বিয়ান। নাড়ী কাটতে গিয়ে দেখি সেও লুপ্ত।]

চর্যাপদের সাধক কবিরা নিত্যকালের বাঙালী অভিযাত্রীর ঐতিহাসিকোচিত কাহিনীকে চিরকালের রসরূপ দিয়েছেন। সাধারণ বাঙালীর দৈনন্দিন জীবন যে, দুঃখ, দীনতা এবং জটিলতায় ভরা, তাকে কাব্যাঞ্জলিতে সশ্রদ্ধভাবে নিবেদন করেছেন তাঁরা। এক্ষণে তাঁদের অবহিত চিত্ততার পরিচয় সুস্পষ্ট। আত্মসচেতন, সুস্থ সামাজিকতার দৃষ্টি নিয়ে সিদ্ধাচার্যরা অনুভব করেছিলেন, নির্যাতিত মানুষের অমানুষিক জীবনযন্ত্রণা,—সর্বব্যাপী পীড়ন শোষণের অসহায় আর্তনাদ। যেহেতু প্রতিকারের উপায় তাঁদের হাতে ছিল না, তাই নিরুপায় মনের অভিযোগ পরোক্ষভাবে উজাড় করে দিয়েছেন তাঁদের রচনায়। তাঁদের এই ক্ষীণ প্রয়াসের অন্তরালে অংকুরিত হচ্ছিল নবীন জাগৃতি—আদি বাংলার জনমানবের দিকদর্শন। চর্যাগানে তারই এক প্রচ্ছন্ন প্রতিরূপ চুম্বক আকারে আভাসিত।

দেবী অন্নদা ঃ আর্যব্রাহ্মণ্যধর্ম বনাম প্রাগার্য কৌমধর্মের প্রভাব

অর্চনা মল্লিক

মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গলশ্রেণীর কাব্যের একাধিক ধারার প্রথমধারায় অপৌরাণিক চণ্ডী ও মঙ্গলচণ্ডীর কাহিনী, দ্বিতীয় ধারায় মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত চণ্ডীর কাহিনী ও তৃতীয় ধারায় অন্নদা বা অন্নপূর্ণাদেবীর মাহাত্ম্যসূচক কাহিনী বিবৃত। এই তৃতীয় ধারায় একককাব্য 'অন্নদামঙ্গল'-এর একক কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। তিনি পৃষ্ঠপোষক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে তাঁরই উপাস্যা কুলদেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্যসূচক এই কাব্য রচনা করেন। তিনটি খণ্ডে বিভক্ত এই কাব্যের প্রথম ও তৃতীয় খণ্ডেই প্রকৃতপক্ষে দেবী অন্নদা বা অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য কীর্তিত।

এই অন্নদাদেবীর কুলপরিচয় উদঘাটনে যাদের দেবপরিকল্পনার দ্বারস্থ হতে হয়, তারা প্রাগার্য কৌম-সমাজের মানুষ। সন্তান-উৎপাদন ও ফসল-ফলানো—আদিম মানুষের চিন্তা এই দ্বৈত উদ্দেশ্যের প্রতিই নিবদ্ধ ছিল।১ সুতরাং প্রজনন ব্যাপারটাই তার কাছে সর্বাধিক গুরুত্ব অর্জন করেছিল। সে মনে করত প্রজননশক্তি এক দৈবশক্তি এবং যেহেতু জননীগর্ভই ভ্রূণের নিঃসংশয়িত আশ্রয়স্থল, তাই সে কল্পনা করে নিল যে নারীর মধ্যেই সেই শক্তি বিরাজমান। এই ধারণা নিয়েই আদিম কৃষিনির্ভর সমাজ শস্যসম্ভারদাত্রী বসুন্ধরা বা ধরিত্রীকেও জীবনদাত্রী মানবীজননীর মহিমামণ্ডিত করে তাঁকে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে, রক্তাক্ত অর্ঘ্য নিবেদন করেছে সে তাঁরই তুষ্টি কামনায়। হরপ্পায় প্রাপ্ত একটি শীলের একপিঠে পৃথিবীজননীর প্রতীক এক নারীমূর্তির যোনি-প্রদেশ থেকে একটি চারাগাছ নির্গত হতে দেখা যায়।২ সম্ভবতঃ ইনিই পৃথ্বীদেবীর সর্বপ্রাচীন ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন। শীলটির উল্টোপিঠে এই দেবীর উদ্দেশ্যে নরবলিদানের বীভৎস ঘটনার চিত্রণ লক্ষ্য করা যায়।৩

শুধু ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই কৃষিনির্ভর সমাজে এই ধরিত্রী মাতার পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায়। সেমিটিক অঞ্চলের প্রধানা মাতৃদেবীগণ, যেমন কেনানের অশ্‌তরেথ, সিরিয়ার অতারগতিস্‌, ব্যাবিলনের 'ইশ্‌তার"—সবাই মূলতঃ পৃথিবীমাতা। গ্রীসের 'গইয়া' দেবীও ফলসম্ভারদাত্রী ধরিত্রীজননী, ডিমেটারও পৃথিবীমাতা বা শস্যমাতা, রোমানদের প্রাচীন পৃথিবীমাতাকে 'টেরামাতারা বলা' হয়। মেক্সিকোতেও পৃথ্বীদেবীর পূজার প্রচলন ছিল।৪

ঋগ্বেদে ঋষিকবিগণ আশ্রয়দাত্রী, অন্নদাত্রী, ধনদাত্রী, মধুময়ী পৃথিবী-জননীর স্তবে উচ্ছ্বলিত। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্তবের সে উচ্ছ্বাস নিবেদিত হয়েছে পিতা দ্যৌ ও মাতা পৃথিবীর প্রতি একত্রে, এককভাবে পৃথিবীমাতার প্রতি নয়—

"মধুনো দ্যাবাপৃথিবী মিমিক্ষতাং মধুশ্চ্যুতা মধুদুঘে মধুব্রতে।
দধানে যজ্ঞং দ্রবিণং চ দেবতা মহি শ্রবো বাজমস্মে সুবীর্যম্।
উর্জং নো দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ পিন্বতাং পিতামাতা বিশ্ববিদা সুদংসসা।
সংররাণে রোদসী বিশ্বশম্ভুবা সনিং বাজং রয়িমস্মে সমিন্বতাম্ " ॥"৫

মধুক্ষারয়ত্রী, মধুদুঘা, মধুব্রতাং দেবতাভূতা এবং আমাদের যজ্ঞ, ধন, মহৎ, যশ, অন্ন ও সুবীর্যদানকারিণী দ্যাবাপৃথিবী আমাদের মধুধারা সিক্ত করুন। পিতা দ্যুলোক এবং মাতা পৃথিবী আমাদের অন্নদান করুন। বিশ্ববিৎ, সুকর্মা পরস্পর রমমাণ এবং সকলের সুখকারিণী দ্যাবা পৃথিবী আমাদের পুত্রাদি, বল এবং ধন প্রেরণ করুন।৬ আবার—

"উর্বী সদ্মনী বৃহতী ঋতেন হুবে দেবানামবসা জনিত্রী।
দধাতে যে অমৃতং সুপ্রতীকে দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ॥৭

আমি দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত বিস্তীর্ণ নিবাসভূত, মহানুভব ও শস্যাদি সমুৎপাদক দ্যাবাপৃথিবীকে যজ্ঞের জন্য আহ্বান করি। এদের রূপ আশ্চর্য, এরা জল ধারণ করেন। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমাদের মহাপাপ হতে রক্ষা করুন।৮

অথর্ববেদের পৃথিবীসূক্তে প্রথম 'দৌ'-ব্যতিরিক্ত একক পৃথিবীমাতার কাছে আর্য-ঋষিদের বিস্তৃত প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে—"বিশ্বভরা বসুধানী প্রতিষ্ঠা হিরণ্যবক্ষা জগতো নিবেশনী" ৯—এই পৃথিবী বিশ্বম্ভরা' বসুন্ধরা—এই-ই প্রতিষ্ঠাস্থল, এ সুবর্ণবক্ষা, যা কিছু চলমান তাদের নিবেশিনী।১০ আবার, "যস্যামন্নং ব্রীহিযবৌ যস্যা ইমা পঞ্চ-কৃষ্টয়ঃ। ভূম্যৈ-পর্জন্য পত্ন্যৈ নমোঽস্তু বর্ষমেদসে"১১—যাতে অন্ন—যাতে ব্রীহিযব, যার এই পঞ্চমানব—পর্জন্যপত্নী বর্ষাপুষ্ট সেই ভূমিকে নমস্কার।১২ কোথাও পিতৃদেবতার সঙ্গে একত্রে, কোথাও বা ধরিত্রীজননীকে এই সশ্রদ্ধ আর্য-প্রণাম, তাকে আর্যরা লাভ করেছেন বিজিত অনার্য উপজাতীর দেবমণ্ডল থেকেই। অনার্য প্রতিবেশীর অনুসরণেই আর্যদের পৃথিবীদেবীকে এই মধুর "মাতৃ"-আহ্বান! পশুপালক আর্যজাতি যখন এদেশের মাটিতে এসে কৃষির সঙ্গে পরিচিত হল, মিশে গেল কৃষিনির্ভর আদিম কোমের মানুষগুলোর সঙ্গে, তখনই সম্ভবতঃ এই ব্যাপারটি সম্ভব হয়েছিল।১৩ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৫।৩।৫) পৃথিবীকে শ্রী বলা হয়েছে। কতকগুলো পরবর্তীকালের উপনিষদের মধ্যেও পৃথিবীকে শস্য সম্পদের দেবীশ্রী বা লক্ষ্মীর সঙ্গে এক করে দেখা হয়েছে। 'নারায়ণোপনিষদে' এই মৃত্তিকার পৃথিবীকেই দেবী বলা হয়েছে, তিনিই শ্রী—শ্রী বা লক্ষ্মীরূপে তিনিই স্তুতা এবং অর্চিতা। পৃথিবী আবার ভূ-শক্তি নামে বিষ্ণুশক্তিরূপে খ্যাতা। গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় থেকে যত বিষ্ণুর প্রস্তর মূর্তি দেখা যায়, তার অধিকাংশ মূর্তিতেই বিষ্ণুর উভয় পার্শ্বে তাঁর দুই শক্তির অবস্থান—এঁরা হলেন শ্রীও ভূ। শ্রী ও ভূশক্তি হয়ত এখানে পৃথিবীরই সম্পদশক্তি এবং প্রজননশক্তির পরিচয় বহন করে।১৪

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ১৫ (১১।৪৬-৪৯) আবার এই পৃথিবীদেবীকে মহাদেবী চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্ন প্রতিপাদিত করা হয়েছে। শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টিজনিত নিঃশস্যা পৃথিবীতে বুভুক্ষু জীবগণের কাছে আপন দেহ সম্ভূত উদ্ভিজ্জের পসরা নিয়ে শাকম্ভরী মূর্তিতে যিনি আবির্ভূতা, তাঁর মধ্যে অন্নদাত্রী, প্রাণদাত্রী ধরিত্রী-জননীকেই নূতনরূপে দেখা যায়। পৃথিবীদেবী ও তাঁর পূজা থেকেই আবার শস্যদেবী এবং শস্যপূজার উদ্ভব হয়েছে। আমাদের দেবীপূজার ভিতরে এই শস্যপূজা নানাভাবে মিশে রয়েছে।১৬ শারদীয়া দুর্গাপূজার এক প্রধান অঙ্গ নবপত্রিকা পূজা। এতে নয়টি উদ্ভিদের পত্র ও এদের অধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাণী, কালী প্রভৃতি নয়টি দেবীকে আবাহন ও অর্চনা করা হয়। দুর্গাপূজার এই অংশটি শস্যশ্যামলা ভূমিমাতারই পূজা বলে অনুমিত হয়। অন্নপূর্ণা বা অন্নদাও সেই ভূমি ও

শস্যদেবতারই আর এক প্রকাশ।১৭ 'স্কন্দপুরাণ' কাশীখণ্ডের উত্তরার্দ্ধখণ্ড সপ্তনবতিতম অধ্যায়ে অন্নদা বা 'অন্নপূর্ণা' নামের উল্লেখ না থাকলেও, সেখানে বুভুক্ষু ব্যাস ও তাঁর দশ সহস্র শিষ্যের কাছে দেবী, অন্নদাত্রী—অন্নপূর্ণা মূর্তিতেই আবির্ভূতা। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের 'বৃহৎতন্ত্রসার:' গ্রন্থে এই দেবীর স্তোত্র এরূপ—

"বিচিত্র বসনে দেবী অন্নদানরতেঽনঘে।
শিবনৃত্যকৃতামোদে অন্নপূর্ণে নমোঽস্তুতে॥
সাধকাভীষ্টদে দেবি ভবদুঃখবিনাশিনি।
কুচভারনতে দেবী অন্নপূর্ণে নমোঽস্তুতে॥" ১৮

হে দেবি! আপনি বিচিত্রবস্ত্র পরিধানপূর্বক সর্বদা অন্নদান করে থাকেন, হে নির্মলে, আপনি মহেশ্বর-দর্শনে আমোদ করে থাকেন, হে অন্নপূর্ণে, আপনাকে নমস্কার করি। হে দেবি! আপনি সাধকবৃন্দের বাঞ্ছাপূরণ করে থাকেন, হে ভবদুঃখহারিণি, হে স্তনভারনতাঙ্গি দেবি, অন্নপূর্ণে আপনাকে নমস্কার করি।১৯

রোমক দেবমণ্ডলে 'অন্নপেরেন্না' নামক এক অন্নাধিষ্ঠাত্রী দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। রোমবাসীরা আভেন্টাইন পর্বতে গেলে এই দেবী তাঁদের অন্নদান করেন। আমাদের অন্নপূর্ণাদেবীর মত এঁরও পূজা হত চৈত্র মাসে।২০ এঁদের উভয়ের সাদৃশ্যের কারণ আবিষ্কার করা দুরূহ ব্যাপার। হয়ত এ সাদৃশ্য নিতান্তই আকস্মিক।

যাই হোক, অন্নদা বা অন্নপূর্ণাদেবীর মূল উৎস অনার্য আদিবাসী পরিকল্পিত ধরিত্রীমাতা একথা স্বীকার করতেই হয়, কিন্তু ইনি আর্যশাস্ত্রে স্বীকৃতি পেয়ে, আর্যকল্পনায় অভিষিক্তা হয়ে, হয়ে উঠেছেন মহাদেবী চণ্ডীর অন্যতম প্রকাশ, হয়েছেন দেবী অন্নপূর্ণা! আর্যকল্পনায় পরিষিক্তা, আর্যশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা, দেবভাষায় স্তুতা এই দেবীর অনার্য পরিচয় লুপ্ত হয়েছে, অন্নদামঙ্গল কাব্যের কবি ভারতচন্দ্র এঁর সন্ধান পেয়েছেন ঐ দেবভাষায় লিখিত আর্য গ্রন্থেরই পৃষ্ঠায়।

মুসলমান শাসনের প্রতিক্রিয়ায় ও চৈতন্য প্রভাবে পৌরাণিক তথা উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব মঙ্গলকাব্যে প্রচুর পরিমাণে পড়তে শুরু করে, ভারতচন্দ্রের আলোচ্য কাব্যে সেই পৌরাণিক প্রভাবেরই চূড়ান্ত রূপ লক্ষ্য করা যায়। তাই প্রচলিত মঙ্গলকাব্যের দেবীর চেয়ে এ দেবী অনেক বেশী করুণাময়ী, শুভঙ্করী অর্থাৎ মাতৃরূপিণী। কোপনতা, ক্রূড়তা, প্রতিহিংসাপরায়ণতা, ছলনা এঁর চরিত্র থেকে প্রায় অন্তর্হিত। ভারত-কাব্যের এই দেবী প্রকৃতই অন্নদাত্রী, ঐশ্বর্যদাত্রী, মাধুর্যময়ী।

শিব কাশীতে অন্নপূর্ণাপুরী নির্মাণ করে অন্নপূর্ণাকে তথায় অধিষ্ঠিত করার জন্য কঠোর তপস্যায় মগ্ন হলেন। তা দেখে ব্রহ্মা, হরি, ইন্দ্র, বরুণ, শমন, কুবের এবং ব্রহ্মর্ষি-রাজর্ষিগণ সকলেই 'একাসনে তপস্যা করতে লাগলেন। তখন—

"করুণা আকর মাতা দয়া হৈল চিতে।
কহিতে লাগিলা দেবী হাসিতে হাসিতে॥
চিরদিন তপস্যায় পাইয়াছ দুঃখ।
অনশনে সকলের শুখায়েছে মুখ॥

এস এস বাছা সব মুখে অন্ন খাও।
শেষে মনোনীত বর দিব যাহা চাও ॥"২১

দেবীর এ মূর্তির—এ মাতৃমূর্তির তুলনা নেই! এই মধুক্ষরা, মধুময়, মাধুর্যসিক্ত মাতৃকণ্ঠস্বর মঙ্গলকাব্যের দেবীকণ্ঠে কিছুটা বিরলশ্রুত।

আবার, হরি-হরে ভেদবুদ্ধিজনিত অপরাধে যখন কাশীতে ব্যাসদেবকে ভিক্ষাদান নিষিদ্ধ করে দিলেন শিব, তখন পতির বিরাগভাজন এই ব্যক্তিটিও অনশন-কাতর মুখচ্ছবি তাঁর করুণাকে জাগ্রত করে—

"মেঘে করে যেমন সকলে জলদান।
তেমনি অন্নদাদেবী সকলে সমান ॥

. ° °

হরিহর প্রভৃতিরো শত্রুমিত্র আছে।
শত্রুমিত্র একভাব অন্নদার কাছে ॥
চলিলেন অন্নপূর্ণা ব্যাসে করি দয়া।
আগে আগে যায় জয়া পশ্চাতে বিজয়া ॥" ২২

এ জননীর কাছে শত্রু-মিত্রের ভেদ নেই। করুণার অকূল সিন্ধু যাঁর অন্তরে কল্লোলিত, যাঁর মঙ্গল-হস্ত দ্বারা সেই করুণা অন্নরূপে পরিবেশিত—সেই অন্নপূর্ণা জননীর কাছে ত কোনও ভেদবোধ প্রত্যাশিত নয়!

ভবানন্দ-গৃহে যাত্রাপথে খেয়াঘাটের ঈশ্বর পাটুনীও সম্পদদাত্রী, লক্ষ্মীরূপিণীদেবীর অহৈতুকী দয়ার প্রসাদে ধন্য হয়েছে, দেবীর চরণস্পর্শে তার কাঠের সেঁউতি হয়েছে স্বর্ণবিমণ্ডিত—

"সেঁউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতী হইল সোনা দেখিতে দেখিতে ॥ ২৩

দারিদ্র্যপীড়িত এই পাটুনীর প্রার্থনাও তিনি পূরণ করেন—"দুধেভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান।" ঈশ্বরী পাটুনী ত হরিহর বা ভবানন্দ নয়, যারা দেবীর পূজাপ্রচার করার জন্য মর্তে এসেছে। সুতরাং তার প্রতি এই দয়া কোনও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়, এজন্যই আন্তরিক, পবিত্র।

সমগ্র কাব্যেই যে দেবীর ব্যবহার মালিন্যহীন, একথা অবশ্য বলা যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই কাব্যে প্রচুর পরিমাণে পৌরাণিক প্রভাব পড়লেও এবং পুরাণের প্রভাবে দেবীর শান্ত-সৌম্য-মঙ্গলময়রূপের প্রকাশ দেখা গেলেও যেহেতু কবি ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের কবিদেরই শেষ উত্তরাধিকারী, সেজন্য তাঁর কাব্যবর্ণিত দেবীর অঙ্গ থেকে 'মনসা' ও 'লৌকিক চণ্ডী'র গন্ধ সম্পূর্ণ মুছে দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। মনসাদেবী অনার্য-পূজিতা ও অনার্য-পরিকল্পিতা। এঁর অনার্য-উৎসের পরিচয় এঁর আচারে-আচরণে-রুচিতে অত্যন্ত উগ্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে মনসামঙ্গল কাব্যের প্রতিটি ছত্রে—। বিমাতা চণ্ডীর সঙ্গে কলহে, মনসা-পূজায় অনিচ্ছুক ও মনসার প্রতি বিরূপ চাঁদসদাগরের গুয়াবাড়ী বা নাখরা বন ধ্বংসে, ছলনার আশ্রয় নিয়ে চাঁদের মহাজ্ঞান-হরণে, তার বিবাহিত সপ্ত পুত্রের জীবন-নাশে, শ্বশুরবিবধে ও খাদ্যাখাদ্য-বিচারশূন্যতায় মনসার উগ্র প্রতিহিংসাপরায়ণতা চূড়ান্ত পাশবিকতা ও

কুরুচির পরিচয় প্রকাশিত। কোনও আর্য-পরিকল্পিতা দেবীর এই মানসিকতা থাকা সম্ভব নয়। অমার্জিত, অনার্য আদিবাসীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই তাদের দেব-চরিত্রেও পরিস্ফুট।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কালকেতু-কাহিনীর দেবী ও ধনপতি-কাহিনীর দেবী উভয়েরই অনার্য-পরিকল্পিতা। এঁরা যথাক্রমে আদিম নিষাদজাতির শিকারের দেবী ও মেয়েলি ব্রতের দেবী।২৫ এঁদের মধ্যে ধনপতি-কাহিনীর দেবীর ব্যবহারেই অনার্য-বৈশিষ্ট্য অধিক পরিস্ফুট। তাঁর প্রবঞ্চনাস্পৃহা, নির্মমতা ও চারিত্রিক রূঢ়তার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে তাঁর পূজায়-বিমুখ ধনপতি সদাগরকে তাঁর সর্ব-প্রকার বিপর্যস্ত করার প্রচেষ্টায়। যাই হোক্, মনসাদেবী ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দেবীর চারিত্রিক বিশিষ্টতা ভারতচন্দ্রের কাব্যের অন্নদা-চরিত্রকে কিছুটা প্রভাবিত করেছে একথা অস্বীকার করা যায় না। তাই অন্নদাদেবীর মধ্যে মাঝে মাঝে পূজালোলুপতা, ছলনা-স্পৃহা, প্রতিহিংসা গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা ও কোপনতার চকিত প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বেদব্যাস শিবের বারাণসীর প্রতিস্পর্ধী দ্বিতীয় কাশীনির্মাণের ইচ্ছায় একদা অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণাকে ধ্যান করলেন। ব্যাসের এই দ্বিতীয় কাশীনির্মাণের আকাঙ্ক্ষাকে বরদাস্ত করলেন না দেবী। এতে তাঁর স্বামীর যে অপমান হবে! তখন জরতীবেশে তিনি ব্যাসকে ছলনা করলেন, ব্যাস-বারাণসী যে গৰ্দ্দভ-বারাণসীতে পরিণত হবে এই অভিশাপবাণী তিনি স্বয়ং ব্যাসের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করালেন। একদা এই ব্যাসকে অন্নদান করে তাঁর ভক্তির পাত্র উদ্ধার করে নিয়েছিলেন তিনি নিজের চরণতলে। ঐ ভক্তিরই বশে ব্যাস দ্বিতীয় কাশী নির্মাণেচ্ছায় তাঁকেই ধ্যান করলেন, অথচ সেই ব্যাসকেই দেবী ছলনা করে নিদারুণভাবে তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন! এর কারণ প্রতিহিংসা, স্বামীর অপমানের জন্য প্রতিহিংসা—

"সক্রোধে কহেন শিবা কৌতুক করহ কিবা
কি হয় তাহার দেখ বসি।
এত বড় তার সাদ তোমাসনে করি বাদ
করিবেক ব্যাস বারাণসী ॥

• ° °

বলি রাজা ভগবানে ত্রিপাদ ধরণীদানে
অধোগতি পাইল যেমন।
তেমনি ব্যাসেরে গিয়া শাপ দিব বর দিয়া:
শুনিয়া সানন্দ পঞ্চানন।" ২৬

ব্যাস অনেক দোষ করেছেন কিন্তু তিনি কি ঐ মহাশক্তির আঘাতের যোগ্য? ব্যাসের জন্য কোনো শেষ ক্ষমা, অনাচার-উপেক্ষাকারী কোনো শেষ মাতৃস্পর্শ কি থাকতে পারতো না? বড় দুঃখে অভিমানে ব্যাস তাই বলেছেন—

"শরীর করিনু ক্ষয় তোমারে ভাবিয়া।
কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া ॥" ২৭

মনসা-চণ্ডী প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যের পূজালোলুপা দেবীগণের মত আপন পূজাপ্রচার-মানসে লঘু-পাপে গুরুশাপ দিয়ে স্বর্গবাসীগণকে মর্ত্যে পাঠানোও দেবী অন্নদার দ্বারা ঘটেছে। বসন্তের কুঞ্জবনে

জায়ার সঙ্গে কামোন্মত্ত হবার অপরাধে কুবেরের অনুচর বহুক্ষরকে মর্ত্যে প্রেরণ করলেন দেবী, হরিহোড়রূপে, আপন পূজাপ্রচারের উদ্দেশ্যে :—

"অন্নপূর্ণা ক্রোধ মনে শাপ দিল দুইজনে
যেমন করিলি দুরাচার।
মরত ভুবনে যাও মনুষ্য-শরীর পাও।
ভারতের এই যুক্তি সার।" ২৮

কুবের-পুত্র নলকুবেরকেও এমনই মধুমাসে দুই কামিনী নিয়ে বাসন্তীলীলায় মত্ত হবার অপরাধে দেবী কর্তৃক অভিশপ্ত হয়ে মর্ত্যে আসতে হলো ভবানন্দরূপে :—

"অন্নদা ভাবিয়া ব্রতের লাগিয়া
শাপ দিলা তিনজনে।
মর্ত্যলোকে যাও নরদেহ পাও।
রায়গুণাকর ভণে।।" ২৯

হরিহোড়কে দিয়ে পূজাপ্রচারের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়ে যাবার পর তাকে ছলনা করে ছেড়ে ভবানন্দের কাছে যেতে এ দেবীর বাধে না :—

ইতঃপর অন্নপূর্ণা হরিহোড়ে ছাড়ি।
আসিবেন ভবানন্দ মজুমদার বাড়ী
গৃহচ্ছেদে হরিহোড় সতত উন্মনা।।
দিনে দিনে নানা মত বাড়িছে যন্ত্রণা।
একদিন পূজায় বসিয়া ধ্যান করে।
তার কন্যা হয়ে দেবী গেলা তার ঘরে।।
মনে আছে তার পূর্ব-দিবস হইতে।
জামাই এসেছে তার কন্যারে লইতে।।
অন্নপূর্ণা বিদায় চাহিলা সেই ছলে।
ক্রোধভরে হরিহোড় যাহ যাহ বলে।।
ওই ছলে অন্নপূর্ণা ঝাঁপি লয়ে করে।
চলিলেন ভবানন্দ মজুমদার ঘরে।।" ৩০

এত গেল অন্নদামঙ্গলকাব্যের প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত দেবীঅন্নদার কীর্তিকথা। এ কাব্যের তৃতীয় খণ্ডেও তাঁর এই অনার্য্য মনোবৃত্তির প্রকাশ দেখা যায়। দিল্লীর বাদশাহের আদেশে মানসিংহ সৈন্যদল নিয়ে প্রত্যাপাদিত্যকে দমনোদ্দেশ্যে বাংলায় এসে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে বিপন্ন হলে তাঁর কানুনগো অন্নপূর্ণা রূপাপুষ্ট ভবানন্দ মজুমদার অন্নবিতরণ করে তাঁর ও সৈন্যদলের প্রাণরক্ষা করেছিলেন। প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করে মানসিংহ দিল্লী যাত্রা করার সময়ে ভবানন্দকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন বাদশাহ কর্তৃক তাকে 'ইনাম' দেওয়াবার জন্য। মানসিংহ ভবানন্দের প্রতি দেবী অন্নপূর্ণার রূপার কথা বলায় বাদশাহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে হিন্দুধর্ম ও দেবদেবীর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করলেন ও ভবানন্দকে বন্দী করলেন।

তখন দেবীর উদ্যোগে দিল্লীতে দারুণ অত্যাচার শুরু হ'ল :—

"ভাকিনী যোগিনী শাখিনী পেতিনী
গুহ্যক দানব দানা।
ভৈরব রাক্ষস বোক্কস খোক্কস
সমরে দিলেক হানা।।
. . . .
টাকরে চাপড়ে আঁচড়ে কামড়ে
মরিছে যবনসেনা।
রক্তের পাতারে ভৈরব সাঁতারে।
গগনে উঠিছে ফেনা।" ৩১

এছাড়াও—

"বিবীরে পাইল ভূতে প্রলয় পড়িল।
পেশবাজ ইজার ধমকে ছিঁড়া দিল।।
চিতপাত হয়ে বিবী হাত পা আছাড়ে।
কত দোয়া দরূদ দিনু তবু নাহি ছাড়ে।।" ৩২

স্বজাতি-নিন্দায় বা আত্ম-নিন্দায় রুষ্টাদেবীর, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার আকাঙ্ক্ষায় এই হীন-পন্থা অবলম্বন, বাদশাহের সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গীর প্রতিবাদে এই সাম্প্রদায়িক মানসিকতার বশীভূত হয়ে তাণ্ডব-সৃষ্টি, একান্তই নিন্দনীয় ব্যাপার সন্দেহ নেই। অনার্য আদিম সমাজের মানুষগুলোর রুক্ষ মানসিকতার প্রভাব পড়েছে যে সব লৌকিক দেবী-চরিত্রে, সেই সব দেবীরই ছায়াসম্পাত অন্নদা-চরিত্রেও।

১। "In the earlist phases of man's social existence his thought was conditioned by the urge to promote the propagation of his race and the production of crops"—Indian mother Goddess, N. N. Bhattacharya, 1971, p. 15. ২। Mahenjodaro and the Indian Civilization, Edited by Sir J. Marshall, V·—1, 1931, chap.—V, p. 52. ৩। ঐ, পৃঃ ৫২। ৪। Encyclopaedia of Religion and Ethics, Edited by J. Hastings, V—5, p. 29-30 থেকে তথ্য সংগৃহীত। ৫। ঋগ্বেদসংহিতা (২য় খণ্ড) হরফ প্রকাশনী, ৬।৭০।৫-৬। ৬। ঋগ্বেদসংহিতা (২য় খণ্ড), হরফ প্রকাশনী, পৃঃ—৮৪। ৭। ঐ, (১ম খণ্ড), ১।১৮।৬। ৮। পৃঃ—২৪৬ ৯। অথর্ববেদসংহিতা, হরফ প্রকাশনী, ১২।১।৬। ১০। অনুবাদ—ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃঃ—১৯। ১১। অথর্ববেদসংহিতা, হরফ প্রকাশনী, ১২।১। ২। ১২।

অনুবাদ—ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য, পৃঃ—২০। ১৩। Religion and Folklore of Northern India By W. Crooke, 1926, p.—47. ১৪। ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য—শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃঃ—২২-২৩। ১৫। শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত, ১৩৮২। ১৬। ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য—শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃঃ—২৪। ১৭। দ্বিজমাধব রচিত—মঙ্গলচণ্ডীর গীত (দ্বিতীয় সংস্করণ)—সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত—১৯৬৫, ভূমিকা, পৃঃ ৩১। ১৮। বৃহৎ তন্ত্রসার:—উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ৪র্থ পরিচ্ছেদ, পৃঃ—৪৭৩। ১৯। অনুবাদ—ঐ। ২০। বিশ্বকোষ, প্রথম খণ্ড, ১২৯৩ সাল, পৃঃ—৩৫। ২১। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী—সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, তৃতীয় সংস্করণ ১৩৬৯, অন্নদামঙ্গল প্রথম খণ্ড, পৃঃ—৮৫। ২২। ঐ, পৃঃ—১০৩। ২৩। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, তৃতীয় সংস্করণ, অন্নদামঙ্গল, প্রথম মণ্ড, পৃঃ ১৫৮। ২৪। ঐ, পৃঃ—১৫৯। ২১। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, আমাদের গ্রামাসমাজে, বিশেষভাবে নারীদের ভিতর, যে সব ব্রত আজও প্রচলিত তার অধিকাংশই অবৈদিক, অস্মার্ত, অপৌরাণিক ও অব্রাহ্মণ্য এবং মূলত গুহ্য জাদু ও প্রজননশক্তির পূজা, যে পূজা গ্রাম্য কৃষিসমাজের সঙ্গে একান্ত সম্পৃক্ত—বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, সংক্ষেপিত সংস্করণ, পৃঃ—২২৮-২২৯। ২৬। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, সম্পাদক, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, তৃতীয় সংস্করণ, অন্নদামঙ্গল, প্রথম খণ্ড, পৃঃ—১২৭। ২৭। কবি ভারতচন্দ্র—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, পৃঃ—২৯৭। ২৮। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, তৃতীয় সংস্করণ, অন্নদামঙ্গল, প্রথম খণ্ড, পৃঃ—১৩৭। ২৯। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ ; বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, তৃতীয় সংস্করণ, অন্নদামঙ্গল, প্রথম খণ্ড, পৃঃ—১৫৯। ৩০, ঐ পৃঃ ১৫৫-৫৬। ৩১। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, তৃতীয় সংস্করণ, অন্নদামঙ্গল, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ—৩১৩। ৩২। ঐ, পৃষ্ঠা—৩১৪।

মহাকবি পাণিনি

কালীজীবন চক্রবর্তী

বৈয়াকরণ-শিরোমণি পাণিনি নাকি এক (?) সর্গবদ্ধ মহাকাব্যেরও রচয়িতা। ইহার সর্গসংখ্যা যে ১৮'র কম ছিল না তাহার লিখিত প্রমাণ আছে।১ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ভল্লুকরাজ জাম্ববানের কন্যা জাম্ববতীকে হরণ ও বিবাহের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া 'জাম্ববতী-হরণ' বা 'পাতাল-বিজয়' নামে এই কাব্য বা মহাকাব্য রচিত হয়। দুঃখের বিষয়, বর্তমানে অখণ্ড বা খণ্ডিত আকারে ইহার কোন পুঁথি পাওয়া যায় না, দুই তিন শত বৎসর পূর্বেও পাওয়া যাইত বলিয়া মনে হয় না। অন্য গ্রন্থাদিতে ইহার ছিটে-ফোঁটা উদ্ধৃতির মাধ্যমেই কেবল ইহার নামমাত্র অস্তিত্ব বজায় আছে।

প্রায় ৪০০০ সূত্র নিবদ্ধ এবং ৮ অধ্যায়ে বিভক্ত পাণিনির ব্যাকরণের নাম 'অষ্টাধ্যায়ী'। ইহা একাধারে লৌকিক (সংস্কৃত) এবং বৈদিক ভাষার ব্যাকরণ। রচনা-নৈপুণ্যে ইহা ব্যাকরণ-বিজ্ঞানের চূড়ান্ত বিস্ময়রূপে পরিগণিত। ধাতুপাঠ, গণপাঠ প্রভৃতি ইহার আনুসঙ্গিক গ্রন্থগুলিও পাণিনির নামে চলে। তিনি এক প্রাকৃত ব্যাকরণও নাকি রচনা করিয়াছিলেন।২

বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত পেশোয়ার জেলায় শলাতুর গ্রামে খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতকে পাণিনির জন্ম। শলাতুরের বর্তমান নাম লাহুর (Lahur 'Lahore' নয়)। শলাতুর হইতে তাঁহার একটি নাম শালাতুরীয়। পৈত্রিক নাম আহিক, পাণিনি গোত্র-নাম, মাতার নাম অনুসারে তাঁহাকে দাক্ষীপুত্রও বলা হয়।

খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে নন্দরাজমন্ত্রী বররুচি কাত্যায়ন অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রাবলীর পরিপূরকরূপে কতকগুলি অতিরিক্ত সূত্র রচনা করেন। এইগুলিকে বার্তিকসূত্র বা সংক্ষেপে শুধু বার্তিক বলা হয়। গদ্যে ও পদ্যে এইগুলি রচিত।

সুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা মগধরাজ পুষ্যমিত্রের (খৃঃ পূঃ ১৮৫-১৪৮) পুরোহিত পতঞ্জলি পূর্বোক্ত বার্তিক সমূহের তাৎপর্য বিচারপূর্বক অষ্টাধ্যায়ীর অর্ধেকেরও কম সূত্রের (মোট ১৭১৩টি সূত্র) অবলম্বনে যে ভাষ্য রচনা করেন, তাহাই বিদ্বজ্জগতে 'মহাভাষ্য' নামে বিখ্যাত। সূত্র-বার্তিক-ভাষ্যের রচয়িতা পাণিনি-কাত্যায়ন-পতঞ্জলির সমন্বিত কৃতিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে পাণিনীয় ব্যাকরণকে 'ত্রিমুনি ব্যাকরণ'ও বলা হয়।

মহাভাষ্যে (১।৪।১) উদ্ধৃত একটি শ্লোক-বার্তিকে ৩ পাণিনির উদ্দেশে 'কবি' আখ্যার প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়। সেখানে অবশ্য পাণিনির নামোল্লেখ নাই। আবার ভাষ্যকার পতঞ্জলিও এই প্রসঙ্গে কিছু লিখিয়া যান নাই। খৃঃ ১১শ শতকে মহাভাষ্যের প্রদীপ-টীকায় কৈয়ট 'কবি' শব্দের যে ব্যাখ্যা দিলেন তাহাতেও পাণিনির উল্লেখ নাই। তিনি লিখিলেন—'কবিশব্দো মেধাবিবচনঃ ক্রান্তদর্শনাৎ" অর্থাৎ কবি শব্দ ক্রান্তদর্শী মেধাবী অর্থের বাচক। ইহা ঈশোপনিষদের "কবি-মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতো-ঽর্থান্ ব্যদধাৎ" ইত্যাদি (৮) বাক্যকে স্মরণ করাইয়া দেয়। খৃঃ ১৮শ শতকে বৈয়াকরণকেশরী নাগেশ ভট্ট মহাভাষ্যপ্রদীপের উদ্দ্যোত-টীকায় এক্ষেত্রে ক্রান্তদর্শী কবি যে স্বয়ং পাণিনি তাহা স্পষ্ট

করিয়াই জানাইয়া দিলেন ক্রান্তদর্শনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া—"কবিঃ ক্রান্তদর্শনো ভবতীতি নিরুক্তাদিতিভাবঃ। ক্রান্তানি দর্শনানি যেনেতি বিগ্রহঃ। স চাত্র পাণিনিরিতি বোধ্যম্।" ইঁহারা কেহই পাণিনির কাব্যকর্তৃত্বের কথা বলিলেন না। অবশ্য ক্রান্তদর্শী কবি কাব্যকার নাও হইতে পারেন।

বার্তিক প্রণেতা কাত্যায়নের সাত শত বৎসর পরে খৃঃ ৪র্থ শতকে রচিত 'কৃষ্ণচরিত' গ্রন্থে মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত প্রকারান্তরে দাক্ষীসুতের অর্থাৎ পাণিনির কাব্যকর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"ন কেবলং ব্যাকরণং পুপোষ দাক্ষীসুত স্বেরিত বর্তিকৈর্যঃ।
কাব্যেঽপি ভূয়োঽনুচকার তংবৈ কাত্যায়নোঽসৌ কবিকর্মদক্ষঃ ॥১০॥"

অর্থাৎ কাত্যায়ন কেবল বার্তিক রচনার দ্বারা দাক্ষীসুতের ব্যাকরণকে পুষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, পরন্তু কাব্যেও তাঁহাকে অনুকরণ করিয়াছিলেন। 'কবিকর্মদক্ষ' কাত্যায়নের সেই কাব্যের নাম ছিল 'স্বর্গারোহণ'—যাহার সন্ধান আমরা পাই নাই। তবে মহাভাষ্যে (৪।৩।১০১) যে বাররুচ কাব্য' ৪ উদাহৃত হইয়াছে তাহা খুব সম্ভব বররুচি কাত্যায়ন রচিত এই কাব্যকে উদ্দেশ করিয়াই।

পাণিনির নামে প্রচলিত কাব্যের নামটি আমরা জানিতে পারি খৃঃ ৯ম ১০ শতাব্দীর পণ্ডিত রাজশেখরের নামে প্রচলিত একটি শ্লোক হইতে—যাহার সন্ধান তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'কাব্যমীমাংসা'য় মিলে না। শ্লোকটি এই—

"স্বস্তি পাণিনয়ে তস্মৈ যস্য রুদ্রপ্রসাদতঃ।৩
আদৌ ব্যাকরণং কাব্যমনু জাম্ববতীজয়ম্॥"

জল্হনের 'সূক্তিমুক্তাবলী' গ্রন্থে এবং খৃঃ ১২শ শতকে রচিত পুরুষোত্তমদেবের 'হারাবলী' কোষে রাজশেখরের নামে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্লোকোক্তি হইতে জানা যায়, পাণিনি মহাদেবের প্রসাদে প্রথমে ব্যাকরণ এবং পরে 'জাম্ববতী জয়' কাব্য রচনা করেন। অন্যান্য গ্রন্থের উদ্ধৃতি হইতে এই কাব্যের 'পাতাল বিজয়' ও 'জাম্ববতী হরণ' নাম দুইটিও পাওয়া যায়। উদ্ধৃতাংশের পর্যালোচনায় প্রমাণিত হয় যে, ভল্লুকরাজ জাম্ববানের কন্যা জাম্ববতীকে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীরূপে লাভের ঘটনাই ছিল এই কাব্যের উপজীব্য বিষয়। ব্রহ্মপুরাণে (১৬শ অধ্যায়), বিষ্ণুপুরাণে (৪।১৩) হরিবংশে (৩৮শ অধ্যায়) এবং শ্রীমদ্ ভাগবতে (১০।৫৬) বর্ণিত স্যমন্তকমণির উপাখ্যানের সহিত ইহার সাদৃশ থাকার কথা। পৌরাণিক মূল বক্তব্যটির, কাব্যানুরোধে, সবিশেষ পল্লবিত হইবারই সম্ভাবনা। তাহাতে অবশ্য আপত্তির কিছুই নাই। আসল সমস্যা পাণিনি প্রকৃতপক্ষে এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন কিনা।

পূর্বোক্ত রাজশেখর অপেক্ষা প্রাচীনতর আর কেহ এই কাব্যের সম্বন্ধে জানিতেন বলিয়া প্রমাণ নাই। পরবর্তীকালে যাঁহারা এই কাব্য হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন, তাঁহারা প্রায়শঃ ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ অশুদ্ধ প্রয়োগের উদাহরণ দিতে এবং স্থল-বিশেষে তাহার দুর্ঘটনা লইয়া তর্কজালের অবতারণা করিতে ঐ রূপ করিয়াছেন। পাণিনির মতো বৈয়াকরণের রচনায় ব্যাকরণ-ভুল দেখাইতে পারিলে কিঞ্চিৎ বাহাদুরী লাভের সম্ভাবনা থাকে বই কি। আশ্চর্যের বিষয়, পাণিনির পক্ষে এই ধরণের কাব্য-রচনা আদৌ

সম্ভবপর কিনা—এই জাতীয় কোনো প্রশ্নের দূরাভাসও তাঁহাদের রচনায় লক্ষিত হয় না। কবির পক্ষে অবশ্য ছন্দের অনুরোধে এবং ভাবপ্রকাশের সবিশেষ আনুকূল্যবশতঃ কচিৎ কদাচিত ব্যাকরণ-বিরোধী পদের ব্যবহার একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার ছিল না এবং তাহা খুব দোষাবহ বলিয়া গণ্য হইত না। ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাসের মতো কবিদের রচনাতেও সে ব্যাকরণ-ভুল একেবারেই নাই এমন নয়। অতি প্রাচীন কবিদের ভুলের সমর্থনে আবার অন্য ব্যাকরণের দোহাই দেওয়া হয়। প্রবাদ আছে—"নিরংকুশাঃ হি কবয়ঃ"। এখানে 'অঙ্কুশ' বলিতে অবশ্য মুখ্যতঃ ব্যাকরণের শাসনই বুঝিতে হইবে। কাজেই কবিরা নিরংকুশ। সমস্যা—বৈয়াকরণ কবি লইয়া। তাহাতে আবার পাণিনির মতো বৈয়াকরণ কবি! ব্যাকরণের এত বড় আচার্যের পক্ষে কি এই রূপ কাব্যরচনা সম্ভব? এই প্রসঙ্গে এই যুগের দেশী-বিদেশী পণ্ডিতদের মতামত প্রবন্ধ শেষে দেওয়া যাইবে।

সংস্কৃত-সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে পাণিনির ও তাঁহার কাব্যের নামে প্রদর্শিত উদ্ধৃতির যে সংগ্রহ আমরা এই প্রবন্ধের জন্য করিয়াছি তাহাদের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলা চলে যে, এই কাব্যে নানা ছন্দে নিবদ্ধ শ্লোক-রাশির মধ্যে উপজাতি ছন্দে রচিত শ্লোকের সংখ্যাই ছিল বেশী এবং গুণগতভাবেও ইহাদের রচনা-সৌকর্য সর্বাধিক চিত্তচমৎকারী। খৃঃ ১১শ শতকে (?) রচিত 'সুবৃত্ততিলকে' (৩।৩০) ক্ষেমেন্দ্র পাণিনির উক্ত ছন্দের রচনার প্রশংসায় লিখিয়াছেন—

"স্পৃহণীয়ং তু চারিত্রং পাণিনেরূপজাতিভিঃ।
চমৎকারৈকসারাভিরুদ্যানস্যেব জাতিভিঃ॥

অর্থাৎ সুন্দর জাতিফুল-প্রধান বাগানের ন্যায় পাণিনির চরিত্র (?) উপজাতি ছন্দে রচিত শ্লোকাবলীর সমাবেশে স্পৃহনীয় (যেহেতু তাঁহার কাব্যে এই ছন্দেরই প্রাধান্য ছিল এবং ইহার মনোজ্ঞ রচনা-নৈপুণ্যে যেন কবির চারিত্রিক সৌন্দর্যেরই প্রতিফলন ঘটিয়াছিল)। ১২০৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীধরদাস সম্পাদিত 'সদুক্তি কর্ণামৃত' নামক সুভাষিত-সংগ্রহে অন্য কয়েকজন বিখ্যাত কবির সহিত দাক্ষীপুত্রও (কবি রূপেই) উল্লিখিত হইয়াছেন—

"সুবন্ধৌভক্তির্নঃ ক ইহ রঘুকারে ন রমতে
ধৃতির্দাক্ষীপুত্রে হরতি হরিচন্দ্রোঽপি হৃদয়ম্।
বিশুদ্ধোক্তিঃ শূরঃ প্রকৃতিমধুরা ভারবিগির
স্তথাপ্যন্তর্মোদং কমপি ভবভূতি বিতনুতে॥"

এখানে সুবন্ধু, রঘুকার (কালিদাস), হরিচন্দ্র, শূর, ভারবি এবং ভবভূতির সহিত দাক্ষীপুত্রের উল্লেখ ও তাঁহার (রচনার) ধৃতি-গুণের কথা বলা হয়েছে।

পুরুষোত্তমদেব তাঁহার 'ভাষাবৃত্তি'তে (ইহা পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের বৈদিকাংশ-বিরহিত ব্যাখ্যা) এই কাব্য হইতে যে উদ্ধৃতি দিয়াছেন, তাহাই বোধ হয় প্রাচীনতম। তিনি লিখিয়াছেন—

"অহো অহং নমোমহ্যং যদ্দৃষ্ট্যা সুমধ্যমা।
উদ্ভ্রান্ত নয়নে দীর্ঘে সাকাঙ্ক্ষমহসীক্ষিতঃ॥"
ইতি জাম্ববতীবিজয়কাব্যে জাম্ববতীদর্শনোত্তরং কৃষ্ণস্যোক্তিঃ"
(—ভাষাবৃত্তি ১।১।১৫)।

ভাষাবৃত্তির অন্যত্র (২।৪।৭৪) আর একটি শ্লোক—

"হরিণাসহ সংখ্যতে বোভূয়িতি যদব্রবীঃ
ন জাঘটীতি যুক্তৌ তৎ সিংহদ্বিরদয়োরিব ।।"

ইতি পাণিনের্জাম্ববতী বিজয় কাব্যম্।' ৩।২।১৬২ সূত্রের ভাষা বৃত্তিতেও পুরুষোত্তমদেব পাণিনির 'জাম্ববতীবিজয়কাব্য' হইতে শ্লোকাংশ উদ্ধার করিয়াছেন॥

ভাষাবৃত্তিরচনার কয়েক বৎসর পরে ১১৭৪ খৃষ্টাব্দে রচিত 'দুর্ঘটবৃত্তি'তে (৪।৩।২৩) শরণদেব 'পুরাতন' শব্দের দুর্ঘটতা দেখাইতে এই কাব্যের তিনটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন—

১। "অস্তি প্রতীচ্যাঃদিশি সাগরস্থ বেলোর্মিগূঢ়ে হিমশৈলকুক্ষৌ ।
পুরাতনী বিশ্রুতপুণ্যশব্দা মহাপুরী দ্বারবতী চ নাম্না ॥

২। "ত্বয়া সহাজিতং যচ্চ যচ্চসখ্যং পুরাতনম্ ।
চিরায় চেতসি পুরস্তরুণীকৃতমস্ত মে ।

৩। "অনেন যাত্রাহুচিতং ধরাধরৈঃ পুরাতনং সাজলতং মহীক্ষিতাম্ ।
দদর্শ সেতুং মহতো জরন্তয়া বিশীর্ণসীমন্ত ইবোদয়শ্রিয়া ।।"

শরণদেব লিখিয়াছেন যে ৩নং শ্লোকটি কাব্যের ১৮শ সর্গ হইতে গৃহীত। 'শার্ঙ্গধর পদ্ধতি' এবং 'সুভাষিতাবলী'তে ধৃত কয়েকটি শ্লোকের কর্তৃক পাণিনিতে আরোপিত হইয়াছে। ১১৪০ খৃষ্টাব্দে রচিত 'গণরত্নমহোদধি' গ্রন্থে (১১৫) বর্ধমান উপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

'তথাহি জাম্ববতী হরণে "বার্হদ্রথং যেন বিবৃতচক্ষুর্বিহস্য সাবজ্ঞমিদং বভাষে।"

রুদ্রট-কৃত 'কাব্যালঙ্কারে'র (২।৮) টীকায় নমিসাধু পাণিনির পাতালবিজয়কাব্য হইতে উপজাতিচ্ছন্দের তিনটি চরণ উদ্ধৃত করিয়া উহাতে মহাকবির ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ পদের প্রয়োগ দেখাইয়াছেন—'.........পাণিনেঃ পাতালবিজয়ে মহাকাব্যে ৬

"সন্ধ্যাবধূং গৃহ্য করেণ ভানুঃ" ইত্যত্র "গৃহ্য" ক্ত্বোল্যবাদেশঃ ।
তথা তস্যৈব কবেঃ......অপশ্যতী বৎসমিবেন্দুবিম্বং
তচ্ছর্বরী গৌরিব হুংকরোতি" ইত্যত্র "পশ্যতী" ইদং লুপ্ত
নকারপদম্। অর্থাৎ মহাকবি প্রযুক্ত "গৃহ্য" এবং "পশ্যতী"

পদ দুইটির স্থলে পাণিনি ব্যাকরণের ৭।১।৩৭ এবং ৭।১।৮১ সূত্রানুসারে যথাক্রমে গৃহীত্বা এবং 'পশ্যন্তী' পদের প্রয়োগ করা উচিত ছিল। সুপদ্ম ব্যাকরণের (২।৩।৭৯) টীকা 'সুপদ্মমকরন্দে' বিষ্ণুমিশ্র শেষোক্ত স্থলে অশুদ্ধ প্রয়োগের কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিয়া লিখিয়াছেন—'তত্র মুনিঃ প্রষ্টব্যঃ' অর্থাৎ মুনি পাণিনিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা উচিত।

খৃঃ ১৫শ শতকের মধ্যভাগে রচিত 'পদচন্দ্রিকা' নামে অমরকোষটীকায় রায়মুকুট একাধিকস্থলে এই কাব্য হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন, যেমন—"সপার্ষদৈরম্বরমাপুপূর" ইতি জাম্ববত্যাংপাণিনিঃ (স্বর্গবর্গ, ৩০), "পয়ঃ পৃষন্তিভিঃ স্পৃষ্টা বান্তি বাতাঃ শনৈঃ শনৈঃ"রিতি জাম্ববতী-বিজয়কাব্যম্' (বারিবর্গ, ২৩৪) এবং 'সৃক্কণী ভীবস্থা চ। "সসৃক্কণী প্রান্ত মসৃক্ প্রদিগ্ধং প্রলেলিহানো হরিণারিরুচ্চৈঃ" ইতি পাণিনেঃ' মনুষ্য বর্গ, ৩৪৯) খৃঃ ১৭শ শতকে রচিত 'চর্করীত' রহস্যে'র ব্যাখ্যায় কবি কণ্ঠহার ধাতুর চর্করীতান্ত

(অর্থাৎ যঙলুগন্ত প্রয়োগ দেখাইতে জাম্ববতীবিজয়কাব্য হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন—

"কৃষ্ণেন সহ মে প্রীতির্বোভবীতি যদব্রবীৎ ।
ন জাঘটীতি যুক্তৌ তৎ সিংহদ্বিরদয়োরিব ।"

ইতি জাম্ববতী-বিজয়কাব্যে।' শ্লোকোক্ত বোভবীতি এবং জাঘটীতি পদ দুইটি যথাক্রমে ভূ এবং ঘট্ ধাতুকে চর্করীতান্ত করিয়া লট্ তিপ্ যোগে নিষ্পন্ন। ইহার সহিত সাদৃশ্যযুক্ত ভাষাবৃত্তিতে উদ্ধৃত ২য় শ্লোকটির যে পাঠান্তর দেখা যায় তাহা ত্রুটিহীন নয়।

জাম্ববতীবিজয় কাব্যের নামে প্রচারিত আরও কয়েকটি শ্লোক নিম্নে যথাপ্রাপ্ত উদ্ধৃত হইল—

"উপোঢ়রাগেণ বিলোলতারকং তথাগৃহীতং শশিনা নিশামুখম্ ।
যথাসমস্তং তিমিরাংশুকং তয়া পুরোঽপি রাগাদ্গলিতং ন লক্ষিতম্ ॥

"বিলোক্য সঙ্গমে রাগং পশ্চিমায়া বিবস্বতঃ ।
কৃতং কৃষ্ণমুখং প্রাচ্যা ন হি নার্যো বিনের্ষ্যয়া ॥

"কহ্লারস্পর্শগর্ভৈঃ শিশিরপরিচয়াৎ কান্তিমদ্ভিঃ করাগ্রৈ
শ্চন্দ্রেণালিঙ্গিতায়াস্তিমিরনিবসনে স্রংসমানে রজন্যাঃ ।
অন্যোন্যালোকিনীভিঃ পরিচয়জনিত প্রেমনিঃস্যন্দিনীভি
র্দূরারূঢ়ে প্রমোদে হসিতমিব পরিস্পষ্টমাশাসখীভিঃ ॥

"অথাসসাদাপ্তমনিন্দ্যতেজা জনস্য দূরোজ্ঝিত মৃত্যুভীতেঃ ।
উৎপত্তিমদ্ বস্তু বিনাশ্য বশ্যং যথাহমিত্যেবমিবোপদেষ্টুম্ ॥

"ঐন্দ্রং ধনুঃ পাণ্ডুপয়োধরেণ শরদ্ধ ধানার্দ্রনখক্ষতাভম্ ।
প্রসাদয়ন্তী সকলঙ্কমিন্দুং তাপং রবেরভ্যধিকংচকার ॥
গতেঽর্ধরাত্রে পরিমন্দমন্দং গর্জত্যসৌ প্রাবৃষি নীলমেঘঃ ।
অপশ্যতী বৎসমিবেন্দুবিম্বং বিভাবরী গৌরিব হুংকরোতি ॥

"প্রকাশ্য লোকান্ ভগবান্ স্বতেজসা প্রভাদরিদ্রঃ সবিতাপি জায়তে ।
অহোঽচলাশ্রীঃ...?...স্পৃশন্তি সর্বং হি দশাবিপর্যয়ে ॥

"অসৌ গিরেঃ শীতলকন্দরস্থঃ পারাবতো মন্মথচাটুদক্ষঃ ।
ঘর্মালসাঙ্গীং মধুরাণিকূজন্ সংবীজতে পক্ষপুটেন কান্তাম্ ॥

"তন্বঙ্গীনাং স্তনৌ দৃষ্টা শিরঃ কম্পয়তে যুবা ।
তয়োরন্তরসংলগ্নাং দৃষ্টিমুৎপাটয়ন্নিব ॥

"শুদ্ধস্বভাবান্যপি সংহতানি নিনায় ভেদং কুমুদানি চন্দ্রঃ
অবাপ্য বৃদ্ধিং মলিনান্তরাত্মা জড়ো ভবেৎ কস্য গুণায় বক্রঃ

"সরোরুহাক্ষীণি নিমীলয়ন্ত্যা রবৌ গতে সাধুকৃতং নলিন্যা।
অক্ষ্ণাংহি দৃষ্টাপি জগৎসমগ্রং ফলং প্রিয়ালোকনমাত্রমেব ।

এই সব শ্লোকে যে সব ব্যাকরণগত ত্রুটি বা ভুল-ভ্রান্তি রহিয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান পণ্ডিত-মণ্ডলীর একাংশ এই কাব্যের পাণিনীয়ত্ব একেবারেই নস্যাৎ করিয়া দিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে

ছিলেন পুণার স্যর রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর (১৮৩৭—১৯২৫), জার্মাণ পণ্ডিত কিলহর্ণ সাহেব (১৮৪০—১৯০৮), বেদজ্ঞ পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী (১৮৪৬—১৯১৯), ইংরেজ পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক এ. বি. কীথ (১৮৮৯—১৯৪৪) এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৪—১৯৮১)। ইহাদের মতে অন্য কোনো কবি এই কাব্য রচনা করিয়া পাণিনির নামে চালাইয়াছেন। পক্ষান্তরে জার্মান্ পণ্ডিত টি ঔফ্রেট (১৮২২—১৯০৭), আর ফিস্কেল (১৮৪৯—১৯০৮) এবং ঐতিহাসিক ভিন্টারনিট্‌জ (১৮৬৩—১৯৩৭) ঐ মতের বিরুদ্ধবাদী। ইহারা রামায়ণ-মহাভারতাদি কাব্যেও ঐ জাতীয় অশুদ্ধ পদের সমাবেশ লক্ষ্য কাব্যানুরোধে জাম্ববতীবিজয়-কাব্যের দোষ বড় করিয়া না দেখিতে এবং ইহার পাণিনীয়তা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক।

আমাদের বিবেচনায় অধুনালুপ্ত এই কাব্যগ্রন্থের পুনরুদ্ধার বিশেষতঃ ইহার একটা বড় অংশ হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক নয়।

১। দুর্ঘটবৃত্তি (৪।৩।২৩)। ২। মলয়গিরি রচিত 'সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি' টীকা এবং কেদার ভট্ট রচিত 'কবিকণ্ঠপাশ' দ্রষ্টব্য। ৩। "দুহিযাচিরুধিপ্রচ্ছি ভিক্ষিচিঞামুপযোগ্য নিমিত্তপূর্বিধৌ। ব্রুবিশাসিগুণেন চ যৎসচতে তদকীতিতমাচরিতং কবিনা॥" ৪। বাররুচ = বররুচি-রচিত। ৫। 'যস্য রুদ্রপ্রসাদতঃ' স্থলে পাঠান্তর 'যস্মাদাবিরভূদিহ'। ৬। লক্ষণীয় এই যে এখানে 'পাতালবিজয়'কে মহাকাব্য বলা হইয়াছে।

সমালোচনা

পুঁথিপত্রের আঙিনায় সমাজের আলপনা ॥ চিত্রা দেব। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা-৯। মূল্য ৮·০০।

পুরানো বাংলা সাহিত্য নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁরা ছাড়া আর কেউ পুথিপত্র নিয়ে তেমন নাড়াচাড়া করেন না। প্রাচীন বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিচয় পেতে গেলে পুরানো বাংলা সাহিত্যের চর্চা ও অনুশীলন আবশ্যিক। আর এই পুরানো বাংলা সাহিত্যের সবটাই পুথির পাতায় আবদ্ধ বলে পুথিচর্চাটা নিতান্ত জরুরী, কিন্তু পুথি নিয়ে অনুশীলন কজনেই বা করেন! গবেষণার তাগিদে নয়, নিতান্ত প্রীতির বশে একালে পুথিচর্চা যাঁরা করেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী দেব একজন। আলোচ্য বইটি তার পরিচয়। পুথি নয়, পুথির পুষ্পিকা থেকে প্রাচীন বাংলার দেশকাল জনজীবনের এক অন্তরঙ্গ সরস ছবি লেখিকা আমাদের উপহার দিয়েছেন। পুথির শেষপাতায় পুথির নাম, লিপিকারের নাম, লিপিকাল প্রভৃতি খুঁটিনাটি কথা যে অংশে লেখা থাকে, তাকে পুষ্পিকা বলে। পরিসরে ক্ষুদ্র, নীরস বিরক্তিকর এই পুষ্পিকা থেকে এত যে চমকপ্রদ তথ্য সংগৃহীত হতে পারে, তা আগে জানা ছিল না। খেটে খাওয়া মানুষের কথা। পুথিনকলচির কথা, মেয়েদের পড়াশুনা, পরকীয়া প্রেম, সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ নানান কথা ফুটে উঠেছে এতে।

বইটিতে দশটি প্রবন্ধ আছে (বাংলা পুঁথির পাঠক, লিপিকারদের আত্মকথা, পুঁথির নাম, শ্রমজীবী মানুষও শিক্ষিত ছিল, মেয়েরাও লেখাপড়া জানতো, সেকালের অভাব অভিযোগ, মধ্যযুগের পরকীয়া প্রেম, মানুষ বিকিকিনির বাজার, সাহেবিয়ানার আগে বাঙালীর পোশাক, পুঁথিপত্রে সাহেব সুবো)। বিষয়ের বিভিন্নতা থাকলেও এগুলোর ভেতর একটি যোগসূত্রের সন্ধান মেলে। লেখিকা সেকালের জনজীবন সম্পর্কে আগ্রহী। মোটামুটি সব কটি লেখাতেই সুখদুঃখভরা জনজীবনের চেহারা আভাসিত এদিক থেকে বইয়ের নামকরণ বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতিসূচক।

পুথির পুষ্পিকা বাঙালীর ইতিহাস রচনার এক অমূল্য উপকরণ হতে পারে কিন্তু এ উপকরণকে কাজে লাগাবার প্রচেষ্টা কেউ করেছেন বলে মনে পড়ে না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিশ্বভারতী প্রভৃতি স্থানে রক্ষিত পুথিপত্রের পাঠক দিনে দিনে কমছে। এমনকালে শ্রীমতী দেবের পুথি নিয়ে আলোচনার আগ্রহও উদ্দীপনা মনে আশা ও আনন্দের সঞ্চার করে।

শুধু পুথি নয়, তাঁর আলোচনার গণ্ডীতে 'পত্র' ও অনুপ্রবেশ করেছে। 'পত্র' বলতে দলিল-দস্তাবেজ, আজির পাট্টা, ছাড়চিঠা, ফর্দ সবই এক ঠাঁই মিলেছে এবং সেকালের সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনকে আলোকিত করে তুলেছে। একথা বলা বাহুল্য যে শ্রীমতী দেবের লেখাগুলো গবেষণাধর্মী নয়। তাই বোধ হয়, পুথির পত্রসংখ্যা, পুথির নাম, পুথির প্রাপ্তিস্থান—এ সবের নির্দেশ দেওয়া তাঁর কাছে জরুরী ছিল না। তথ্য বা তত্ত্বপ্রতিষ্ঠা নয়, সহজ সরলতায় সেকালের মানুষের

সুখদুঃখ আনন্দবেদনাসম্পৃক্ত প্রাত্যহিক জীবনের ছবি ফুটিয়ে তোলা তাঁর উদ্দেশ্য এবং সেদিক থেকে তিনি আশ্চর্যভাবে সফল। নীরস বিষয়ও লেখার গুণে যে কী পরিমাণে সরস ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠতে পারে বইটি না পড়লে তা বোঝা যাবে না।

ত্রুটির কথা বলি। বইটি বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধের সংকলন। আলাদাভাবে যখন প্রবন্ধগুলো বার হয়েছিল, তখন পাঠকের বোঝার জন্ত 'পুষ্পিকার' ব্যাখ্যা প্রবন্ধগুলোতে প্রয়োজনীয় ছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় এ পুনরুক্তি পরিহার করলে ভাল হত। কিছু কিছু ছাপার ভুল রয়েছে কয়েকটি উল্লেখ করা উচিত। শিবায়ণ (পৃ. ২৪), কী রাত (পৃ. ২৮), পচিশ (পৃ. ৫২), ১২৭৬ (পৃ. ৭০)। যথাক্রমে হবে—শিবায়ন, কিরাত, পাঁচশ, ১১৭৬। ২৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত কেন্দুর এবং টেন্দুর—এ দুটির কোনটাই হবে না। অবশ্যই এখানে মুদ্রণপ্রমাদ আছে। 'অঙ্কুর' হবে। লেখিকার একটি জিজ্ঞাসার জবাব দিই। টাকায় বারো সের চালু (চাল) সাড়ে ছয় পণ (দেড় সের ?) চালু সের হইল (পৃ. ৩৮)। সাড়ে ছয় পণ = সাড়ে ছয় আনা। বাক্যটির মানে হল– টাকায় যেখানে বারো সের চাল মিলত, এখন সেখানে একসেরের দামই সাড়ে ছ আনা (পণ—অশীতি বরাটক, কুড়িগণ্ডা কড়ি, তণ্ডুল্য পণ, এক আনা—বঙ্গীয় শব্দকোষ)।

পরবর্তী সংস্করণে এসব সংশোধিত হবে আশা রাখি। মলাট আকর্ষণীয়, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। বইয় নামটি পুঁথির হরফের ছাঁদে লেখা হলে এবং পরিশেষে দু-একটি পুষ্পিকার প্রতিলিপি যুক্ত থাকলে বেশ হত। বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

নরেশচন্দ্র জানা

পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (জীবনালেখ্য) ॥ আশা গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক : অক্ষর, ৫০ নন্দনা পার্ক কলিকাতা-৩৪ প্রাপ্তিস্থান : জিজ্ঞাসা, কলিকাতা ৯/২৯ দাম : কুড়ি টাকা।

যে কোন জীবনী, তাহা সাধারণ বা অসাধারণ কোন ব্যক্তিরই হউক, সমকালীন সমাজ জীবন ধারার প্রচলিত রীতি নীতি সংস্কার আদর্শ ও ঘটনার নানা সংঘাতের প্রতিক্রিয়ার ছবি ধরিয়া রাখে। কখনও জীবনীকার স্বয়ং সেগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখান, কখনও বা সজাগ পাঠককে সেগুলি আহরণ করিতে হয়।

সুলেখিকা শ্রীমতী আশা গঙ্গোপাধ্যায় এই পিতৃজীবনী রচনা করিয়া শুধু যে পিতৃতর্পণ করিয়াছেন তাহা নহে; বাঙালীর সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনায় সহায়ক যে সব বিবিধ উপকরণাদির প্রয়োজন তাহারই একটি অমূল্য অংশ তিনি আমাদের ব্যবহারের জন্ত সাহিত্যের ভাণ্ডারে সযত্নে রাখিয়া দিয়াছেন।

লেখিকা সূচনায় সবিনয়ে বলিয়াছেন, ইহা জীবনালেখ্যমাত্র। পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের জন্ম ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে, নড়াইল মহকুমার আক্ষণডাঙা গ্রামে। কথিত আছে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তের

দীক্ষাগুরু বিপ্র কেশবভারতী ইঁহার পূর্বপুরুষ। মাত্র দশ বৎসর বয়সে আড়াই বৎসরের বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ সেকালের রীতির কথা স্মরণ করায়। দৌলতপুর ও মূলাজোড় টোলে শিক্ষালাভ ও কাব্যতীর্থ উপাধিলাভের পর নবদ্বীপ পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা 'বিদ্যাভূষণ' উপাধিভূষিত হন। হাওড়া জেলার নারিট বিদ্যালয় ও মূলাজোড়ে কিছুকাল অধ্যাপনার পর কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন কলেজে যোগদান করেন। এরপর শিক্ষা সংস্কৃতির দিকপাল পণ্ডিতমণ্ডলীর (যথা, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, লক্ষণ শাস্ত্রী, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ) সহিত তাঁহার যোগাযোগ ঘটে সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে। অতি অল্পবয়সী এই অধ্যাপক স্বীয় তীক্ষ্ণধী প্রতিভার বিস্ময়কর ছাপ রাখিয়াছিলেন এবং সেইজন্ত 'খোকা পণ্ডিত' নামে পরিচিত হন। তাঁহার লেখা 'দণ্ডবিধিবিচার' সরকারের সহস্রমুদ্রা পুরস্কার লাভ করে!

রাজেন্দ্রনাথ মূলতঃ ছিলেন সাহিত্যিক এবং সাহিত্যসমালোচক। তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহের নাম, কালিদাস, কালিদাস ও ভবভূতি, শ্রীকণ্ঠ, তপোবন, পিতৃহারা, রসবিচার। আলংকারিকের বিচার-দক্ষতা ছাড়াও রসগ্রহণের ও রস-পরিবেশনের দুর্লভ বৈদগ্ধ্যই ছিল তাঁর জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। আর ছিল বিনয়ী অথচ নির্ভীক, সরল অথচ দৃঢ়, শান্ত অথচ সংগ্রামী প্রাণোজ্জ্বলতা। সর্ব অবস্থায় অটলতা ও আনন্দলোকস্থিতি,—এই ছিল তাঁর চরিত্র। জ্ঞানী কর্মযোগী, একজন অক্লান্ত সৈনিকের পরিচয় পাওয়া যায় এই জীবনালেখ্যর পাতায় পাতায়। দেশপ্রীতি গ্রামোন্নয়ন, সংস্কারমুক্ত রাজেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর সন্দর্শনে বাজা কেউটে, রবীন্দ্রসকাশে, বালীগঞ্জ উন্নয়নে, শিক্ষাপ্রসারে রাজেন্দ্রনাথ, জগবন্ধু বিদ্যালয়ের জন্ম প্রভৃতি অধ্যায় তাঁহার চরিত্রটি বুঝিবার জন্ত বিশেষ সহায়ক! ইহা ছাড়াও গ্রন্থসন্নিবিষ্ট শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী, শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর, পণ্ডিত সুধাময় শাস্ত্রী, শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী প্রভৃতি স্বনামধন্য পণ্ডিতবর্গের 'স্মৃতিচারণ' গ্রন্থটিকে নিটোল পরিপূর্ণতা ও অশেষ মর্যাদা দিয়েছে। এগুলি অতিশয় মূল্যবান তথ্যে এবং ব্যক্তি রাজেন্দ্রনাথের পুণ্য চরিত্র বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ। কন্যার পিতৃচরিত্র চিত্রণ অপেক্ষা এইসব স্মৃতিচারণ পাঠক ও গবেষকদের নিকট বিশেষ সমাদৃত হইবারই কথা। গ্রন্থশেষে রাজেন্দ্রনাথের গ্রন্থসমূহের প্রকাশকাল, ভূমিকা, উৎসর্গপত্র, প্রভৃতি যাবতীয় সংবাদ যথাসম্ভব দেওয়া হয়েছে। সর্বাধিক মূল্যবান সংযোজন, প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের একাদশ অধিবেশনে সাহিত্য বিভাগের সভাপতিরূপে প্রদত্ত, পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথের অভিভাষণ। রাজেন্দ্রনাথ ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যে যে একাধারে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক ছিল তাহা স্মরণীয়। আশুতোষের বিধবা কন্যা কমলার দ্বিতীয় বিবাহে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়া রাজেন্দ্রনাথ নির্ভীকতার পরিচয় দেন। শোনা যায়, আর আশুতোষের 'বাংলার বাঘ' নামটি রসিক রাজেন্দ্রনাথের মুখ নিঃসৃত। শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী মহাশয় লিখিয়াছেন : বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখর উপন্যাসে তাঁর এই মানসপুত্রটির পরিচায়নে নৈয়ায়িকসুলভ অনন্য ভঙ্গিতে বলেছেন চন্দ্রশেখর ব্রাহ্মণ ছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন না। এই পরিচয়টি বঙ্কিমোত্তর যুগে পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পর্কে যতখানি সার্থক ততখানি সার্থক হতে দেখিনি আর কারও সম্পর্কে!

ছাত্ররূপে পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথের মতন এমন এক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছাত্রদরদী রসরাজ অধ্যাপকের

সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য এই গ্রন্থসমালোচকের ঘটিয়াছিল। এহেন গুণীজনের জীবনীগ্রন্থের সত্যই বড় প্রয়োজন ছিল।

নন্দন মজুমদার

সিন্ধু সভ্যতার স্বরূপ ও অবদান : শ্রীঅতুল সুর ।। মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা ।। বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা সিরিজ ।। জিজ্ঞাসা, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

মাত্র সত্তর পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা, যার কোনো আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ নেই, বাহার নেই, চটক নেই এবং যাকে স্বল্পমূল্যেই কেনা যায়, এই হলো আলোচ্যমান গ্রন্থটির আপাত-পরিচয়। এই পুস্তিকার বিষয়সূচী : (১) আমি তখন মহেঞ্জোদরোয় (২) সিন্ধুসভ্যতার বিকাশ ও বিস্তার (৩) সিন্ধুসভ্যতার স্বরূপ (৪) সিন্ধুসভ্যতা ও বৈদিক বিরোধিতা (৫) সিন্ধুসভ্যতার গঠনে প্রাগার্যদের দান (৬) সিন্ধুসভ্যতার গণিতের ভূমিকা।

উল্লেখযোগ্য, চমকপ্রদ ও চিন্তাসমৃদ্ধ আলোচনা আরম্ভ হয়েছে ৪৪ পৃষ্ঠা থেকে। সিন্ধুসভ্যতা ও আর্যসভ্যতা কি এক, না ভিন্ন। শ্রীসুরের মত : এক নয়। নানা বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিদ্বারা তিনি শেষ সিদ্ধান্ত করেছেন : আর্যরা সর্বত্রই উন্নতমানের প্রাগার্যসভ্যতার ধ্বংস করে নিজেদের হীন ও বর্বর সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বর্তমান শতাব্দীর দুই দশকের শেষ দিকে সুর মহাশয় বলেছেন, মাত্র এক জায়গাতেই আর্যদের এই অবিরাম সংগ্রাম অবশেষে ব্যর্থ হয়েছে। সেটা হলো এই ভারতবর্ষেই শেষ পর্যন্ত এই অনার্যদের কাছেই নতিস্বীকার। পঞ্চনদ থেকে তারা যতই পূর্বদিকে অগ্রসর হলো ততই এদেশের লোকের সংস্পর্শে এলো। আর্য ও অনার্যদের সংশ্লেষণে পৌরাণিক দেবতামণ্ডলীর সৃষ্টি হলো। বৈদিক আত্মকেন্দ্রীক স্তুতিগানের পরিবর্তে এলো ভক্তি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কার্তিক গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, শীতলা, মনসা, এমনি কতো।

অনার্যদের মাতৃদেবীর পূজা, আদি শিব, লিঙ্গযোনি পূজা সূর্যপূজা, নাগপূজা ইত্যাদিও বিশদভাবে এ পুস্তিকায় আলোচিত হয়েছে।

'দেশজ কৃষ্টি'র প্রাচীনতার দিকে দৃষ্টি রেখে সিন্ধুসভ্যতার সঙ্গে প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার সাদৃশ্য কথা আলোচনায় এসেছে এবং এই সূত্রে যোগিনীতন্ত্রের একটা চমকপ্রদ শ্লোকের উল্লেখ করে শ্রীসুর বলেছেন : মিশর ক্রীট সুমের এশিয় মাইনর সিন্ধু উপত্যকা ও অন্যত্র তাম্রাশ্ম সভ্যতার যে উন্মেষ ঘটেছিল, খুব সম্ভবতঃ সে সভ্যতার আদি জন্মস্থান পূর্বভারতে এবং পশ্চিমবঙ্গের সামুদ্রিক বণিকরাই তার বীজ ও মাতৃকাদেবীর উপাসনা পৃথিবীর দূরদেশসমূহে নিয়ে গিয়েছিল। শ্রীসুর মহাশয়ের একটি মৌলিক জিজ্ঞাসা : বাঙলা কি সভ্যতার জন্মভূমি ?

মতভেদের অবকাশ অনেক ; কিন্তু গবেষণালব্ধ এইসব অভিমতের বর্তিকা নিয়ে ধূসর অতীতের অন্ধকার প্রান্তরে যে-সব ছড়ানো ছিটানো নুড়ি আছে সেগুলোকে কুড়িয়ে পরীক্ষা করা ভালো।

সরিৎশেখর মজুমদার